মহাত্মা গান্ধীর—

কারাকাহিনী

অনুবাদক—শ্রীঅনাথ নাথ বসু

হুগলী বিদ্যামন্দির

প্রকাশক—
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত
বিচিত্রা প্রেস লিমিটেড
৪৯এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আট আনা

প্রিণ্টার—
শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র সেনগুপ্ত
বিচিত্রা প্রেস লিমিটেড
৪৯এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

যে মনীষির চিন্তার ধারা বর্ত্তমান ভারতকে সত্য আদর্শে পরিচালিত করিতেছে, তাঁহার বিচিত্র জীবনটীকে বুঝিতে হইলে নানা দিক দিয়া বুঝিতে হয়। সেই একটী দিক তাঁহার লিখিত এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া কারাজীবনের ভিতরেও কি ভাবে তাঁহার শান্ত প্রতিরোধের আদর্শ ক্রমবিকশিত হইয়াছে তাহার একটুকু ছবি এইখানে আমরা দেখিতে পাই।

এই স্বচ্ছ সরল কাহিনী বর্ত্তমান জীবনের কয়েকটা সমস্যার কিছু সমাধান করিতে পারে মনে করিয়াই এই দীন অনুবাদটী বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে আনিতে সাহস পাইয়াছি। মূল পুস্তকটী গুজরাতী ভাষায় লিখিত, পরে গান্ধিজী তাহা হিন্দীতে লেখেন। সেই হিন্দী সংস্করণ হইতেই অনুবাদ করিয়াছি। পুস্তকখানির প্রকাশক কানপুরের 'প্রতাপ' পত্রের সত্বাধিকারী আমাকে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি দিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

এই পুস্তকটীর জন্মের সহিত অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের স্নেহ ও চেষ্টা একান্ত ভাবে জড়িত। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা করিয়াছেন; প্রুফ দেখার ভারও তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারই অর্থ ব্যয়ে পুস্তকটী মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টা ভিন্ন এ কার্য্য আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার সামর্থ্য আমার নাই।

পরিশেষে, অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা সম্ভব নয়, তবুও ভাব-অনুবাদের চেয়ে ভাষা-অনুবাদের দিকে দৃষ্টি অধিক রাখিতে হইয়াছে।

ভাষার সরল স্বচ্ছ গতি গান্ধিজীর লেখার একটী বিশেষত্ব, সেইটী পাঠক এইখানে পাইবেন না ; তবুও যদি এই অনুবাদ পাঠকের নিকট তাঁহার বক্তব্যের কিছুও প্রকাশ করিতে পারে তাহা হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

বিদ্যামন্দির
হুগলী
২৫শে অগ্রায়ণ, ১৩২৯

বিনীত
শ্রীঅনাথ নাথ বসু

কারাকাহিনী

[প্রথম বার]

আমি ও আমার ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ কিছুদিন কারাগারে বাস করিয়া আসিয়াছি। এই অল্পদিনে যে টুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা অন্যের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে, এবং অনেকে সে বিষয়ে জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশও করিয়াছেন। জেলের মধ্য দিয়া এখনও কতখানি অধিকার আমাদিগকে, ভারতবাসীগণকে, লাভ করিতে হইবে তাহা সকলেরই জানা উচিত—সকলেরই সেখানকার সুখদুঃখের সহিত পরিচয় থাকা উচিত। কারাদশার দুঃখ কতকটা কাল্পনিক, তাহার অধিকাংশেরই কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই। সকল বিষয়েই যথার্থ জ্ঞান হিতকর বিবেচনায় মদীয় কারা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৯০৮ সালের ১০ই জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে দুই বার আমার জেলে যাওয়ার গুজব উঠে; শেষটায় বাস্তবিকই আমার ডাক পড়িল। আমার সঙ্গীগণকে ও আমাকে দণ্ড দেওয়ার পূর্ব্বে প্রিটোরিয়া (ট্রান্সভাল) হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল, যদি ধৃত ভারতবাসিগণ নূতন আইন মানিতে রাজী না হয়, তবে তাহাদের অর্থদণ্ড ও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া গেল। জরিমানা অনাদায়ে আরও তিনমাস কারাদণ্ড-ভোগ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া অধিক দণ্ড চাহিলাম, কিন্তু পাইলাম না। আমাদের সকলকে দুই মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। আমার সঙ্গী ছিলেন মিঃ পি কে নাইডু, মিঃ সি এম্ পিলাই, মিঃ কড়োয়া, মিঃ ঈষ্টন ও মিঃ ফোরটুন। শেষোক্ত ভদ্রলোক দুইটী চীনদেশীয়। দণ্ডাদেশ দেওয়ার পর আদালতের পিছনে হাজত ঘরে দুই চারি মিনিট আমাকে রাখা হইল। পরে অন্যের অজ্ঞাতে আমাদিগকে একটি গাড়ীতে বসান গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমার মনেও কত চিন্তাতরঙ্গ উঠিতে লাগিল। আমাকে সুদূরে কোথাও লইয়া গিয়া রাজনৈতিক বন্দিদের মত অবস্থায় ফেলিবে কি? না, অন্য সকল হইতে দূরে রাখিবে? আমাকে কি জোহান্সবার্গ ছাড়া অন্য কোথাও লইয়া যাইবে? এইরূপ কত চিন্তা এই সময়ে আমার হৃদয়ে উঠিতেছিল। আমার প্রহরায় যে সৈনিক নিযুক্ত ছিল সে আমার ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছিল, তাহাকে বলিলাম—"ক্ষমা ভিক্ষার ত কোনও প্রয়োজনই নাই, আমাকে কারাগারে লইয়া যাওয়া ত তোমার কর্ত্তব্য।"

কারাগার।

শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, আমার উদ্বেগের কোনও কারণ নাই। কারণ যেখানে অন্যান্য বন্দীকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল সেইখানে আমাকেও যাইতে হইল। অল্পক্ষণ পরে আরো সঙ্গী আসিয়া জুটিলেন—আমরা সকলে একত্র হইলাম। আমাদের সকলকে ওজন করা হইল, অঙ্গুলির ছাপ লওয়া হইল, তাহার পর উলঙ্গ করিয়া জেলের পোষাক দেওয়া হইল। আমরা পরিধেয় পাইলাম—কালরঙের প্যাণ্ট, সার্ট, সার্টের উপরে পরিবার একটি গাত্রাবরণী (যাহাকে ইংরাজীতে বলে Japper), টুপী ও মোজা। পুরাণা

কাপড় চোপড় রাখিবার জন্য এক একটি থলিও পাইলাম। এইবার আমাদিগকে নিজের নিজের কামরায় পাঠান হইল। তাহার আগে প্রত্যেককে আট আউন্স রুটীর টুকরা দিল। আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল কিন্তু আফ্রিকার আদিম অধিবাসী কাফ্রিদের জেলে।

কাফ্রি ও ভারতবাসী।

সেখানে আমাদের কাপড়ের উপর "N" ছাপ দেওয়া হইল, অর্থাৎ আমরা নেটীভ পঙ্‌ক্তিতে থাকিয়া গেলাম। আমি সকল দুঃখ সহিতেই প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে যে এত দুর্গতি আছে তাহা জানিতাম না। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে রাখিল না, তাহাতে তেমন বিচলিত হই নাই, কিন্তু কাফ্রিদের সহিত থাকা বরদাস্ত করিতে পারিলাম না। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, সত্যাগ্রহ সংগ্রাম যেরূপ মহৎ তেমনি ঠিক সময়ে তাহার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন ইহাও প্রমাণ হইয়া গেল, যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল তাহা ভারতবাসীকে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত করিবার মারাত্মক উপায় মাত্র। আমাদিগকে যে কাফ্রিদের সহিত একত্রে রাখা হইয়াছিল তাহাতে ভালই হইল। তাহাদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি, রীতিনীতি ইত্যাদি জানিবার একটী প্রকৃষ্ট সুযোগ পাওয়া গেল। তাহা ছাড়া এ কথাও আমি কোনও মতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না যে তাহাদের সহিত একত্রবাসে আমাদের নাকি অপমান হয়। তবুও সাধারণ রীতি অনুযায়ী বলিতে হয়, ভারতীয়গণকে পৃথক্ রাখাই উচিত। আমাদের কারাকক্ষের পার্শ্বেই কাফ্রিদের স্থান। তাহারা সেখানে ও বাহিরের মাঠে কান্নাকাটি করিতে থাকিত। আমরা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ছিলাম, অর্থাৎ আমাদের দ্বারা কোনও প্রকার কাজ করাইয়া লওয়া হইত না, তাই আমাদের আলাদা আলাদা রাখা হইয়াছিল। নতুবা আমাদেরও একসঙ্গে

ঐ কুঠরীতেই ঠাসা হইত। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ভারতবাসীকে কাফ্রিদের সহিত একত্র রাখা হইত।

ইহাতে বাস্তবিক কোনও অন্যায় হয় কি না সে বিচার ছাড়িয়া দিলেও একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এরূপ ব্যবস্থা অন্যায়। কাফ্রিরা ছিল অধিকাংশই বন্য; জেলের কাফ্রিদের কথা ত' বলা বাহুল্য। তাহারা অতিশয় কলহপ্রিয় ও অপরিষ্কার ছিল, এবং বন্য পশুর ন্যায় থাকিত। এক একটি কুঠরীতে প্রায় ৫০।৬০ জনকে ঠাসা হইত। কখনও কখনও তাহারা ঝগড়া চীৎকার করিত, কখনও বা নিজেদের মধ্যে মারামারি করিত। এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বেচারী ভারতবাসীর কিরূপ দুর্দ্দশা হইত. পাঠকগণ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

ভারতীয় অন্যান্য বন্দীগণ।

সমস্ত জেলে আমরা ছাড়া আরও দুই চারি জন ভারতীয় বন্দী ছিলেন। তাঁহাদিগকে কাফ্রিদের সহিত একত্রে বন্ধ থাকিতে হইত। তবুও দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা প্রসন্নচিত্ত ছিলেন, এবং জেলের বাহিরের অর্থাৎ জেলে আসিবার আগের চেয়ে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছিল। তাঁহাদের উপর প্রধান জেলরের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাঁহারা কর্ম্মক্ষম ও দক্ষ ছিলেন, তাই তাঁহাদের জেলের ভিতরেই কাজ দেওয়া হইত। যেমন, ক্ষৌরে, 'মেশিন' দেখা ইত্যাদি। এ সব কাজে তাঁহাদের অভ্যাস ও আগ্রহ ছিল। তাঁহারা আমাদের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

আবাসস্থান।

থাকিবার জন্য আমাকে একটি কুঠরী দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে তেরজন লোকের থাকিবার স্থান ছিল। ঘরের উপর লেখা ছিল, "কপদাকে দণ্ডিত কৃষ্ণবর্ণ কয়েদী।" সম্ভবতঃ সেখানে দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত

কয়েদীদের রাখা হইত। সেখানে আলোক ও বায়ু চলাচলের জন্য দুইটী ছোট গবাক্ষ ছিল, তাহাতে আবার লোহার শক্ত গরাদ দেওয়া। কক্ষে যে বাতাস আসিত, আমার মতে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। কক্ষের গাত্র টিন দিয়া ঢাকা ছিল, তাহাতে আধ ইঞ্চি করিয়া তিনটি ছিদ্র। জেলার অজ্ঞাতে আসিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেখিতেন, কয়েদী কি করিতেছে। আমার কক্ষের সংলগ্ন কক্ষে কাফ্রি কয়েদী থাকিত। তাহাব সহিত একত্রে দণ্ডিত কাফ্রি, চীনী ও 'কেপথোর' কয়েদী ছিল। যাহাতে তাহাবা পালাইয়া না যায় সেজন্য তাহাদের সকলকে একত্রে রাখা হইত।

দিনে বেড়াইবার জন্য আমাদেব একটী ছোট বারাণ্ডা ছিল। তাহার চারিপাশে প্রাচীর। বাবাণ্ডা এতই স্বল্প পরিসর যে তাহাতে চলাফেরা পর্য্যন্ত কষ্টকর। রাজ্যের সীমান্তদেশবাসী কয়েদীদের প্রতি আদেশ ছিল, তাহারা বিনা অনুমতিতে বারাণ্ডার বাহিরে যাইবে না। স্নান ও পায়খানার ব্যবস্থাও ছিল এই বারাণ্ডায়। স্নানের জলের জন্য প্রস্তব নির্ম্মিত দুইটী বড় চৌবাচ্চা, স্নানের জন্য দুইটী স্থান, দুইটী পায়খানা এবং প্রস্রাব করিবার দুইটী স্থানও এই খানে। সেখানে আব্রুর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। জেলের নিয়মেও ছিল যে পায়খানা এইরূপ হওয়া চাই যাহাতে কয়েদীরা আলাদা থাকিতে না পারে। সুতরাং দুই তিন জন কয়েদীকে মলত্যাগের জন্য একই লাইনে বসিতে হইত। স্নান ঘরেরও এই ব্যবস্থা। প্রস্রাব করিবার স্থানটি ত' উন্মুক্ত জায়গায়। প্রথম প্রথম এগুলি আমাদের অসহ্য মনে হইত, অনেকে বড় ঘৃণা বোধ করিত, তাহদের কষ্ট ও হইত। তথাপি, গভীর ভাবে চিন্তা করিলে মনে হয়, কারাগারে ইহা ছাড়া অন্য কোনও ব্যবস্থা সম্ভবে না এবং এই নিয়ম পালনে সাহায্য করায় অন্যায় কিছুই নাই। সুতরাং ধৈর্য্য সহকারে অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলাই সুবিধা, এবং ইহাতে অস্থির হইয়া পড়ায় বা ঘৃণা করার কোনও প্রয়োজন নাই।

কুঠরীর ভিতরে শয়নের জন্য তিন ইঞ্চি উঁচু চারিপায়া কাঠের চৌকি দেওয়া হইত। প্রত্যেক কয়েদীকে, দুইখানি কম্বল, একটি ছোট বালিশ, এবং পাতিবার জন্য একটি 'চাটাই' দেওয়া হইল। কখনও বা তিনখানি কম্বল মিলিত,—তবে তাহা অনুগ্রহ হইলে। দেখা যাইত, এইরূপ শক্ত বিছানা দেখিয়া কেহ কেহ অস্থির হইয়া পড়িতেন। সাধারণতঃ যাঁহাদের নরম বিছানায় শোয়া অভ্যাস, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ শয্যা কষ্টকর। আয়ুর্ব্বেদে কিন্তু শক্ত শয্যাই ভাল বলা হইয়াছে। অতএব গৃহে যদি শক্ত শয্যায় শয়ন করার অভ্যাস থাকে তবে আর কারাশয্যা কষ্টদায়ক হইয়া উঠে না। ঘরে সর্ব্বদা এক ঘড়া জল ও রাত্রে প্রস্রাব করিবার জন্য একটু জল আলাদা রাখা হইত, কারণ রাত্রে কোনও কয়েদীই বাহিরে যাইতে পারিত না। প্রত্যেক লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প একটু সাবান, মোটা সুতার একখানা তোয়ালে এবং একটী কাঠের চামচও দেওয়া হইত।

পরিষ্করণ।

জেলে পরিষ্কার করাটা খুব ভাল হইত। কুঠরীর মেঝে সর্ব্বদা ফিনাইল দিয়া ধোয়া হইত, এবং প্রত্যহই চূণ ছড়াইয়া দেওয়া হইত। সর্ব্বদাই মনে হইত—যেন সব নূতন। স্নানঘর ও পায়খানাও সাবান ও ফিনাইল দিয়া নিত্য পরিষ্কার করিত। এই পরিষ্কার করার কাজটা আমার নিজের খুব ভাল লাগিত। যদি কোনও সত্যাগ্রহী কয়েদীর পেটের অসুখ হইত, তবে আমি নিজে ফিনাইল দিয়া পায়খানা সাফ করিতাম। পায়খানা পরিষ্কার করিবার জন্য প্রত্যহ নয়টার সময় কত চীনী কয়েদী আসিত। ইহার পরে দিনে অন্য কোনও সময়ে পায়খানা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইলে নিজে হাতে করিতে হইত। প্রস্তর নির্ম্মিত চৌবাচ্চা সর্ব্বদা ধোওয়া হইত। শুধু একটা

মুস্কিল ছিল, কয়েদীদের কম্বল ও বালিশ বদলাইয়া যাওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল, কারণ কম্বল বালিশ প্রত্যহ রৌদ্রে দিতে হইত। কয়েদীরা বোধ হয় এ নিয়ম প্রায়ই মানিয়া চলিত। জেলের বারাণ্ডাটি প্রত্যহ দুইবার পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইত।

কয়েকটী নিয়ম।

জেলের কয়েকটী নিয়ম সকলেরই জানা উচিত। সন্ধ্যা ৫॥ টার সময় সমস্ত কয়েদীকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সকলে কথাবার্ত্তা বলিতে বা পড়াশুনা করিতে পারে। ৮ টার সময় সকলকেই শুইতে হয়। কথা বলিলে জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। কান্তি কয়েদীরা এ নিয়ম যথাযথ পালন করে না। তাই রাত্রে তাহাদিগকে চুপ করাইবার জন্য প্রহরী 'ঠুলা', 'ঠুলা' বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে লাঠী ঠুকিত। কয়েদী-দের ধূম পান নিষিদ্ধ ছিল। এই নিয়ম খুব কঠোরতার সহিত রাখিতে হইত। কিন্তু আমি দেখিতাম ধূম পানে অভ্যস্ত কয়েদীগণ লুকাইয়া এ নিয়ম ভঙ্গ করিত। সকালে সাড়ে পাঁচটার সময় শয্যা ত্যাগের ঘণ্টা পড়িত। এই সময়ে প্রত্যেক কয়েদীকে শয্যা ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিছানা গুটাইয়া লইতে হইত। তারপর ছয়টার সময় কুঠুরীর দ্বার খোলা। এই সময়ে সকলে গুটান বিছানার পাশে আসিয়া কায়দা মত দাঁড়াইত। তখন রক্ষক আসিয়া সকল কয়েদীকে গুণতি করিতেন। এইরূপে কুঠুরী বন্ধ করিবার সময়েও (সন্ধ্যাকালে) প্রত্যেক কয়েদীকে বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। জেলের দ্রব্য ছাড়া বাহিরের কোন দ্রব্যই কয়েদীর কাছে থাকা নিয়ম বিরুদ্ধ। কাপড় ছাড়া অন্য কোন জিনিসই গবর্ণরের অনুমতি ব্যতীত সঙ্গে রাখা নিষিদ্ধ ছিল। সকল কয়েদীরই খাটের উপর একটী ছোট পকেট সেলাই করা থাকিত। তাহাতে

রাখা হইত কয়েদীর টিকিট। টিকিটে কয়েদীর নম্বর, দণ্ডের বর্ণনা, নাম ধাম ইত্যাদি লেখা থাকিত। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দিনে কুঠুরীতে থাকিবার অনুমতি ছিল না। যাহাদের কাজে যাইতে হইত তাহাদের ত' কুঠুরীতে থাকা চলিতই না, এমন কি, বিনা শ্রমে দণ্ডিত নিষ্কর্ম্মা কয়েদীদের ও থাকিতে দেওয়া হইত না। তাহাদের বারাণ্ডায় থাকিতে হইত। আমার সুবিধার জন্য গবর্ণর একটী টেবিল ও দুইটী বেঞ্চ রাখিবার অনুমতি দিয়াছিলেন; তাহাতে আমার অনেক কষ্টের লাঘব হইয়াছিল।

নিয়ম ছিল যে দুই মাসের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইবে। ভারতবাসীগণের প্রতি এই নিয়ম বিশেষ কঠোরতার সহিত চালান হইত না। যে আপত্তি করিত তাহার শ্মশ্রু রাখিয়া দেওয়া হইত। এ বিষয়ে একটী মজার কথা শুনুন। আমি নিজে জানিতাম যে কয়েদীদের চুল কাটা হইত; আরও শুনিয়াছিলাম যে কয়েদীদের আরামের জন্যই এরূপ হইত। আমি ত' এ নিয়ম পালনে অভ্যস্ত ছিলাম। আমার কাছে এ নিয়ম উপযোগী বলিয়াই মনে হয়। জেলে চিরুণী ইত্যাদি চুল পরিষ্কার রাখিবার উপকরণ ত পাওয়া যাইত না, আর চুল পরিষ্কার না রাখিতে পারিলে ফুস্‌কুড়ি ইত্যাদি হইবার সম্ভাবনা ছিল। আবার গ্রীষ্মের দিনে চুলের বোঝা বহা অসহ্য হইয়া পড়িত। কয়েদীদের আয়না জুটিত না। শ্মশ্রু ময়লা ও দুর্গন্ধ হইবার ও সম্ভাবনা ছিল। খাইবার সময় রুমালও পাওয়া যাইত না। কাঠের চামচ দিয়া খাইতে বিরক্ত বোধ হইত। শ্মশ্রু বড় হইলে তাহার মধ্যে উচ্ছিষ্ট আটকাইয়া থাকিত। আমার মনে হইত, জেলের সকল অভিজ্ঞতাই লাভ করা উচিত। তাই প্রধান দারোগাকে বলিলাম আমার চুল ও শ্মশ্রু কাটাইয়া দেওয়া হোক্, তিনি উত্তর দিলেন এ বিষয়ে গবর্ণরের কড়া নিষেধ আছে। আমি বলিলাম— আমি জানি যে গবর্ণর আমাকে এ বিষয়ে বাধ্য করিতে পারেন না;

কিন্তু আমি ত' নিজেই রাজি হইয়া চুল কাটাইতে চাই। তাহার উত্তরে তিনি আমায় গবর্ণরের নিকট আবেদন করিতে বলিলেন। পরদিন গভর্ণর অনুমতি দিলেন কিন্তু বলিলেন—'দুই মাসের এই ত' সবে দুই দিন হইয়াছে, এরই মধ্যে তোমার চুল কাটানর অধিকার আমার নাই। আমি বলিলাম —'তাহা আমি জানি। কিন্তু আমি নিজের আরামের জন্য স্বেচ্ছায় চুল কাটাইতে চাই'। তখন তিনি হাসিয়া নিষেধ প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার অনুরোধের মধ্যে কোন রহস্য ছিল কিনা সে বিষয়ে গবর্ণর সাহেবের অনেকখানি ভয় ও সন্দেহ হইয়াছিল। আমার শির মুণ্ডন করিলে ও শ্মশ্রু কাটিলে কোন জোর জবরদস্তীর অভিযোগের গোলমাল আমা হইতে উঠিবে না ত'? কিন্তু আমি বার বার বলিয়াছিলাম যে তাহা উঠিবে না, এমন কি ইহাও বলিয়াছিলাম যে আমি লিখিয়া দিতেছি যে আমি স্বেচ্ছায় চুল কাটিতেছি। তখন গবর্ণরের সন্দেহ দূর হয় এবং তিনি দারোগার প্রতি মৌখিক আদেশ দেন যে আমাকে যেন একটী কাঁচি দেওয়া হয়। আমার সঙ্গী কয়েদী মিঃ পি, কে, নায়ডু চুল কাটিতে জানিতেন। আমিও নিজেও অল্প স্বল্প কিছু জানিতাম। আমাকে চুল ও শ্মশ্রু কাটিতে দেখিয়া ও তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া অন্যান্য সকলেও তাহাই করিল। মিঃ নায়ডু ও আমি প্রত্যহ প্রায় দুই ঘণ্টা করিয়া ভারতবাসিগণের চুল কাটিতাম। আমার ধারণা, ইহাতে আরাম ও সুবিধা দুইই আছে। এ ভাবে কয়েদীদের চেহারাও দেখিতে ভাল হইত। জেলে ক্ষুর রাখা একেবারে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল, শুধু কাঁচি রাখা চলিত।

পর্য্যবেক্ষণ।

কয়েদীদের পর্য্যবেক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী আসিতেন, তাঁহাদের আসিবার সময় সকল কয়েদীকে এক পংক্তিতে দাঁড়াইতে হইত এবং কক্ষ

চারী আসিলে টুপি উত্তোলন করিয়া অভিবাদন করিতে হইত। সকলেরই নিকট ইংরাজী টুপি ছিল সুতরাং সেগুলি উত্তোলন করার অসুবিধা বিশেষ কিছু ছিল না। টুপি তোলা শুধু যে কায়দামাফিক তা' নয়, উচিত ও বটে। যখন কোন পর্য্যবেক্ষক আসিতেন তখন "ফল্ ইন্" (fall in) করিবার আদেশ দেওয়া হইত। আমার কানে এই শব্দটী একান্ত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই শব্দের অর্থ—ঠিক ভাবে এক পংক্তিতে দাঁড়াইয়া থাক। প্রতিদিন চার পাঁচ বার এরূপ হইত। একটী কর্ম্মচারী—তাঁহাকে নায়েব দারোগা বলা হইত—একটু জবরদস্ত ছিলেন; তাই ভারতবাসীগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন, জেনারেল স্মাট্‌স্......। প্রভাতে তিনি কতদিন খুব সকালে নীরবে আসিয়া পড়িতেন, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময়ও একবার ঘুরিয়া যাইতেন। সকালে সাড়ে নয়টার সময় ডাক্তার আসিতেন, তিনি খুব দয়ালু ও ভাল লোক ছিলেন। সর্ব্বদাই খুব সহৃদয় ভাবে কুশল প্রশ্ন করিতেন। জেলের নিয়মানুযায়ী প্রথম দিন প্রত্যেক কয়েদীকে একেবারে উলঙ্গ হইয়া ডাক্তারকে আপনার শরীর দেখাইতে হইত, কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি এ নিয়ম চালাইলেন না। যখন ভারতীয় কয়েদির সংখ্যা বেশী হইয়া উঠিল তখন বলিলেন যে যদি কাহারও চুলকানি বা পাঁচড়া ইত্যাদি হইয়া থাকে তবে তাঁহাকে যেন জানান হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে একান্তে লইয়া গিয়া দেখিবেন।

সাড়ে দশটা এগারটার সময় গভর্ণর ও প্রধান দারোগা আসিতেন। গভর্ণর খুব উপযুক্ত, ন্যায়শীল ও শান্ত স্বভাব ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এক প্রশ্ন করিতেন—তোমরা সকলে ভাল আছ তো? তোমাদের কোন্ জিনিষ দরকার? তোমাদের কোন নালিশ ত নাই? যদি কেহ কোন বিষয় অভিযোগ করিত বা কিছু চাইত, তবে খুব মনোযোগ সহকারে শুনিতেন এবং যতদূর সম্ভব তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন। যে অভিযোগ তিনি সত্য

বলিয়া মনে করিতেন তাহা পূর্ণ ভাবে দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেন। কখনও বা ডেপুটি গভর্ণর ও আসিতেন, তিনিও বেশ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল, সুশীল ও মিশুক ছিলেন আমাদের প্রধান দারোগা। তিনি নিজে খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি আমাদের প্রতি খুব ভাল ও ভদ্র ব্যবহার করিতেন। তাই সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার গুণ গান করিত। কয়েদীরা যাহাতে তাহাদের অধিকার পুরাপুরি ভোগ করে সেদিকে তাঁহার সর্ব্বদাই দৃষ্টি ছিল এবং তাহাদের ছোট খাট অপরাধ তিনি মার্জ্জনা করিতেন। আমাদের নিরপরাধ বিবেচনা করিয়া আমাদের যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। নিজের সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য তিনি কতবার আমার নিকটে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া যাইতেন।

ভারতবাসী কয়েদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

বলিয়াছি যে প্রথমে আমরা পাঁচজন মাত্র সত্যাগ্রহী কয়েদী ছিলাম। ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রধান পিকেট মিঃ থম্বী নায়ডু ও চায়নীজ অ্যাসোশিয়নের অধ্যক্ষ মিঃ কবীন জেলে আসিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া সকলেই প্রীত হইল। ১৮ই জানুয়ারী আরও ১৪ জন আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সমুন্দর খাঁও ছিলেন। তাঁহার দুই মাস কারাবাসের দণ্ড হইয়াছিল। বাকি ১৩ জনের মধ্যে মান্দ্রাজী, কানমীয়া ও গুজরাতী হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা বিনা লাইসেন্সে ফেরী করার অপরাধে ধৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ২ পাউণ্ড জরিমানা হইয়াছিল, এবং জরিমানা দাখিল না করিলে ১৪ দিন জেলের আদেশ হইবে এই নিয়ম ছিল। তাঁহারা সাহস করিয়া জরিমানা না দিয়া জেলে আসিলেন। ২১শে জানুয়ারী মঙ্গলবার আরও ৭৬ জন আসিলেন। তাঁহাদেরই মধ্যে নবাব খাঁও ছিলেন। তাঁহার প্রতি

দুইমাস জেলের আদেশ হইয়াছিল। অন্যান্য সকলের ২পাউণ্ড জরিমানা বা ১৪ দিন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কানমিয়া ও মাদ্রাজীও ছিলেন। ২২শে জানুয়ারী বুধবার আরও ৩৫ জন আসিয়া পড়িলেন। ২৩ শে ৩ জন, ২৪ শে ১ জন, ২৫ শে ২ জন, ২৮ শে সকালে ৬ জন ও সেই দিন সন্ধ্যার সময় আরও ৪ জন আসিলেন। ২৯ শে আরও চারজন কানমীয়া আসিয়া পড়িলেন অর্থাৎ ২৯ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৫ জন সত্যাগ্রহী কয়েদী ওখানে আসিয়া জুটিয়া ছিলেন। ৩০ শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার আমাকে প্রিটোরিয়ায় (ট্রান্সভালে) লইয়া যাওয়া হইল, আমার মনে হয় সেদিনও ৫।৬ জন কয়েদী আসিয়া ছিলেন।

আহার।

ভোজনের সমস্যা এমনি যে সকলেরই এ বিষয়ে বারবার চিন্তা করা উচিত। কিন্তু কয়েদিদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই হয়ত জল খাওয়া অভ্যাস। খাওয়া সম্বন্ধে এই নিয়ম আছে যে জেলের ভিতর যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই খাইতে হইবে। বাহিরের কিছু চলিবে না। সৈনিকদের যে খাদ্য মেলে, তাহাই খাইতে হয়। কিন্তু কয়েদী ও সৈনিকদের অবস্থায় যথেষ্ট পার্থক্য। সৈনিকদিগের ও তাঁহাদের ভ্রাতৃবন্ধুরা জিনিষ পাঠাইতে পারে এবং তাহা তাহারা গ্রহণ করিতেও পারে, সে সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। কিন্তু কয়েদিরা অন্য কিছু লইতেই পারে না, কারণ সে বিষয়ে বিশেষ নিষেধ আছে। জেলে একটা প্রধান অসুবিধা—খাওয়ার কষ্ট। কথাবার্ত্তায় প্রায়ই জেলের অধ্যক্ষ বলেন, জেলে আবার মুখের স্বাদ কি? সুস্বাদু দ্রব্য জেলে দেওয়া হয় না। যখন জেলের ডাক্তারের সহিত আমার কথাবার্ত্তায়

সুযোগ ঘটিল, তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, রুটির সহিত চা অথবা ঘি কিম্বা অন্য কিছু পাওয়া উচিত। তখন উনি বলিলেন "তুমি ত ইহা মুখের স্বাদের জন্য চাহিতেছ, জেলে তাহা পাওয়া যাইবে না"।

এইবার জেলের খাদ্যের কথা। জেলের নিয়ম অনুযায়ী ভারতীয় কয়েদিদের প্রথম সপ্তাহে নিম্নলিখিত খাদ্য দেওয়া হইত।

সকালে—বার আউন্স ভুট্টার আটার লপ্‌সি,—ঘি বা চিনি না দেওয়া।

দ্বিপ্রহরে—বার আউন্স চাউল ও এক আউন্স ঘি।

সন্ধ্যায়—চার দিন ১২ আউন্স ভুট্টার আটার লপ্‌সি, ও তিন দিন ১২ আউন্স ভাজা চাল এবং নুন, কাফ্রিদের যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহার উপর এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শুধু এই প্রভেদ যে তাহাদের খুলা মিশ্রিত ভুট্টা ও চর্ব্বি দেওয়া হইত, কিন্তু ভারতবাসীরা তাহার পরিবর্ত্তে চাউল পাইত।

দ্বিতীয় সপ্তাহে ও তাহার পরে সর্ব্বদাই ভুট্টার আটার সহিত দুই দিন সিদ্ধ আলু ও দুই দিন অন্য কিছু সব্‌জী কোহড়া প্রভৃতি দেওয়া হইত। যাহারা মাংস খাইত, দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে প্রতি শনিবার তাহারা তরকারির সহিত মাংস পাইত।

যাঁহারা প্রথমে আসিয়াছিলেন তাঁহারা স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে তাঁহারা সরকারের কাছে কোন প্রকার সুবিধা প্রার্থনা করিবেন না। যে খাওয়া পাওয়া যায় তাহাতেই চালাইবেন। সকল দিক বিবেচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত খাদ্য ভারতবাসীর উপযুক্ত, এটা বলা যায় না। কাফ্রিদের ত ভুট্টা নিত্য খাদ্য ছিল, সুতরাং ইহাতে তাহাদের খুবই সুবিধা হইতে পারিত এবং তাহা খাইয়া তাহারা জেলে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইত। কিন্তু চাউল ছাড়া আর কিছুই ভারতবাসীর উপযোগী মনে হয় না। [illegible] ভারতবাসীর

ভুট্টার আটা খায়। শুধু ভুট্টার আটা ও "বীন্" খাওয়ার অভ্যাস ত আমাদের মোটেই ছিল না, তাও আবার তরকারি না দিয়া। তাহা ছাড়া যে ভাবে তাহারা খাবার তৈয়ারী করিত, তাহাও ভারতবাসীর পছন্দ হইত না। তাহারা ত তরকারি ধুইত না, আর কোন মশলাও দিত না। এমন কি, শ্বেতাঙ্গদের যে তরকারি দেওয়া হইত, তাহারি খোলা দিয়া কাফ্রিদের তরকারি তৈয়ারি হইত। লবণ ছাড়া তাহাতে আর কিছু দেওয়া হইত না, চিনির কথা ত ছাড়িয়াই দিন।

সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারটা সকলকেই কষ্ট দিতে লাগিল, কিন্তু আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে আমরা, সত্যাগ্রহীরা, জেলের অধ্যক্ষদের কাছে কোন মতেই হাত জোড় করিব না। তাই এ বিষয়ে আমরা কোন প্রকার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলাম না। পূর্ব্বোক্ত খাদ্যেই সন্তুষ্ট রহিলাম।

গভর্ণর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে উত্তরে বলিলাম, "খাদ্য ভাল নয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা কোন প্রকার সুবিধা বা কৃপা ভিক্ষা করি না। সরকার যদি খাদ্যের ব্যবস্থা ভাল করেন ত ভাল কথা, না হইলে এই নিয়ম অনুযায়ী যাহা জুটিবে তাহাই আমরা খাইব"।

কিন্তু এই মনোভাব বেশী দিন টিকিল না। যখন অন্যান্য সকলে আসিলেন তখন আমরা মনে করিলাম, খাওয়া দাওয়ার যে কষ্ট, আমাদের সঙ্গী হইয়া ইঁহারা সেই কষ্ট সহ্য করিবেন, তাহা ভাল নয়। জেলে যে আসিতে হইয়াছে ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইঁহাদের জন্য সরকারের নিকট স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চাওয়াই উচিত। এই বিবেচনায় গভর্ণরের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা চালাইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, আমাদের যেমন তেমন খাবার হইলেই চলে, কিন্তু যাহারা পরে আসিয়াছেন তাঁহারা এরূপ করিতে পারিবেন না। গভর্ণর বিবেচনা করিয়া উত্তর দিলেন যে, শুধু ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যদি স্বতন্ত্র খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে চাহেন ত করিতে পারেন; কিন্তু

খাদ্য যাহা এখন মিলিতেছে তাহাই পাইবেন। অন্য কিছু খাদ্য দেওয়ার অধিকার আমার নাই।

ইতি মধ্যে পূর্ব্ব কথিত আরও ১৪ জন ভারতীয় কয়েদি আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'পূপূ' (লপ্‌সি) খাইতে অস্বীকার করিয়া আহার গ্রহণ না করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তখন আমি জেলের নিয়ম পড়িলাম এবং জানিতে পারিলাম যে এ বিষয়ে আবেদন Director of Prisons এর (কারা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা) নিকট করিতে হইবে। তখন গভর্ণরের অনুমতি লইয়া নিম্নলিখিত আবেদন পাঠান হইল। "আমরা নিম্নে স্বাক্ষরকারী কয়েদিগণ আবেদন করিতেছি যে, আমরা ২১ জন এসিয়াটীক বর্ত্তমানে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছি তাহার মধ্যে ১৮ জন ভারতবাসী আর বাদ বাকী চীন দেশবাসী। ১৮ জন ভারতবাসীর খাদ্যে সকালে 'পূপূ' দেওয়া হয়। আর সকলের জন্য চাল ও ঘি, তিনবার বীন্, আর ৪ বার 'পূপূ' দেওয়া হয়। শনিবার আলু ও রবিবার সব্‌জি দেওয়া হয়। ধর্ম্ম অনুযায়ী আমরা কেহই মাংস ভক্ষণ করিতে পারি না। অনেকের ত মাংস ভক্ষণ ধর্ম্ম নিষিদ্ধই, অনেকের আবার শুদ্ধ মাংস ছাড়া অন্য মাংস খাওয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। চীনীদের চাউলের পরিবর্ত্তে ভুট্টা দেওয়া হয়। আবেদনকারিদের মধ্যে অধিকাংশই ইউরোপীয় রীতি অনুযায়ী ভোজনে অভ্যস্ত, এবং তাঁহারা রুটি ও আটার তৈয়ারি অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ করেন।

আমাদের মধ্যে অনেকের 'পূপূ' মোটেই সহ্য হইত না। ইহাতে অজীর্ণ হইত। আমাদের মধ্যে সাত জন ত সকালে কিছুই খাইত না। কেবল কোন কোন সময়ে চীনী কয়েদীরা দয়া করিয়া আপনাদের রুটী হইতে কয়েক টুকরা দিলে তাই খাইত। আমি গভর্ণরকে এ কথা জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন চীনী কয়েদিদের নিকট হইতে রুটী লওয়া অপরাধ বলিয়াই গণ্য হয়। আমাদের মনে হয় পূর্ব্বোক্ত খাদ্য আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর না

এই কারণে আমবা আবেদন করিতেছি যে 'পূপূ' বন্ধ করিয়া আমাদের জন্য য়ুরোপীয় বীতি অনুসারে খাদ্য দেওয়া হউক, অথবা এরূপ খাদ্য দেওয়া হউক যাহা আমাদেব পক্ষে হানিকর নহে। আমাদের যে খাদ্য দেওয়া হইবে তাহা আমাদের প্রকৃতি ও রীতি নীতি অনুযায়ী হওয়াই উচিত।

এই কাজটী বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং শীঘ্রই ইহাব বিধান হওয়া প্রয়োজন। অতএব আবেদনকাবিগণ প্রার্থনা করেন যে ইহার উত্তর আমাদিগকে যেন টেলিগ্রামে পাঠান হয়।"

এই আবেদনে আমরা ২১ জন নাম স্বাক্ষর কবিয়াছিলাম। স্বাক্ষর করা হইলে আবেদন পত্র পাঠান হইতেছিল, এমন সময়ে আরও ৭৬ জন ভারতীয় কয়েদী আসিয়া পৌছিলেন, তাঁহারাও 'পূপূ' খাইতে নারাজ। তাই আবেদন পত্রের নিম্নে লেখা হইল, "আরও ৭৬ জন কয়েদী আসিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত খাদ্য গ্রহণে তাঁহাবাও অনিচ্ছুক। অতএব শীঘ্রই ব্যবস্থা করা প্রার্থনীয়।" টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্য গভর্ণর সাহেবকে অনুরোধ করিলাম তথন তিনি টেলিফোন যোগে ডিরেক্টারের অনুমতি লইয়া 'পূপূ'র পরিবর্ত্তে চার আউন্স রুটি দেওয়াব হুকুম দিলেন। ইহাতে সকলে খুব খুসী হইল। তখন ২২ শে তারিখ হইতে সকালে চার আউন্স রুটি ও সন্ধ্যায় 'পূপূ' দেওয়ার পরে রুটি দেওয়া হইতে লাগিল। সন্ধ্যায় আট আউন্স রুটি দেওয়ার কথা ছিল। অন্য কোন হুকুম আসা পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় রহিল। এজন্য গভর্ণর একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে আটা, ঘি, চাউল ও দাল দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল। তাহারই মধ্যে আমাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সুতরাং ইহার পর আর কোন কথা উঠিল না।

প্রথমে যখন আমরা আট জন মাত্র ছিলাম তখন আমরা কেহই রাঁধিতাম না। ভাত ভাল হইত না এবং তরকারি বরাদ্দের দিন তরকারি খুবই

খারাপ হইত। তাহা আমরা রন্ধন করিয়া লইবার আজ্ঞাও গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন মিঃ কডবা রন্ধন করিতে গেলেন। তাহার পর মিঃ থম্বী নায়ডু ও মিঃ জীবন, ইঁহারা দুই জন রন্ধন করিতে যাইতেন। শেষাশেষি এই দুই ভদ্রলোককে প্রায় ২০০ জনের জন্য রন্ধন করিতে হইত। রন্ধন এক বেলাই হইত। সপ্তাহে দুই দিন তরকারির বার আসিত, তখন দুই বারই রন্ধন করিতে হইত। মিঃ থম্বী নায়ডু খুবই খাটিতেন। সকলকে ভাগ করিয়া দিবার ও পরিবেশন করিবার ভার আমার উপর ছিল।

পূর্ব্বোক্ত আবেদন পত্রে এমন কথা বলা হয় নাই যে শুধু আমাদেরই জন্য ভোজনের পৃথক ব্যবস্থা করা হউক, বরং ভারতবাসী সকল কয়েদীর জন্যই ব্যবস্থা করিবার প্রার্থনা তাহাতে জানান হইয়াছিল। গভর্ণরের সহিত এই কথাই হইয়াছিল এবং তিনি অনুমতিও দিয়াছিলেন। তখন আশা করা যাইতে পারে যে জেলে ভারতীয় কয়েদিদের আহারের পরিবর্ত্তন হইবে। তাহা ছাড়া, চীনা কয়েদী তিনজনের চাউলের পরিবর্ত্তে অন্য খাদ্য পাওয়া যাইত। তাহাতে অসন্তোষ বাড়িয়া উঠিত এবং ইহাও অনেকে মনে করিতেন যে চীনারা বুঝি আমাদের অপেক্ষা হীন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমি গভর্ণর ও মিঃ প্লেফোর্ডের নিকট আবেদন করিলাম। শেষে অনুমতি পাওয়া গেল, যে চীনারাও ভারতীয়দের মত খাদ্য পাইবে।

য়ুরোপীয়দের যেরূপ খাদ্য মিলিত এইবার সে কথা বলিব। তাঁহাদের সকলকে জল খাবারের জন্য আট আউন্স রুটী ও 'পুপু' সকাল বেলায় দেওয়া হইত। দ্বিপ্রহরে আহারের সময় সর্ব্বদাই রুটী ও সুরুয়া (ঝোল) বা রুটী ও মাংস এবং আলু বা অন্য কোন তরকারি দেওয়া হইত। রাত্রে প্রত্যহই রুটী ও 'পুপু', অর্থাৎ তাঁহারা তিনবার রুটী পাইতেন সুতরাং 'পুপু'র জন্য তাঁহাদের বড় বেশী আগ্রহ ছিল না। পাওয়া যায় ত ভাল, না

পাওয়া যায় ত ভাল, এই ভাব। তাহা ছাড়া তাঁহারা যে ঝোল ও মাংস পাইতেন তাহাও খুব বেশী পরিমাণে, তাঁহাদিগকে চা বা কোকো অনেক বার দেওয়া হইত। ইহাতে বোঝা যায় যে কাফ্রিদের কাফ্রিদের মত ও য়ুরোপীয়দের য়ুরোপীয়দের মতই আহার দেওয়া হইত। বেচারী ভারতীয়গণ মাঝখানে পড়িয়া ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় ছিলেন। তাঁহাদের নিজেদের অভ্যাস অনুযায়ী খাবার পাইবার সৌভাগ্য কোন দিনই হইল না। তাঁহাদের য়ুরোপীয় খাদ্য দেওয়া হইলে শ্বেতাঙ্গেরা লজ্জা পাইতেন। ভারতীয়দিগকে অন্য কিরূপ খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে তাঁহারা তখন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাই শেষ কাফ্রিদের মধ্যেই তাঁহাদিগকে ঢুকাইয়া দেওয়া হইল।

এই অবিচার আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। চক্ষু মেলিয়া কেহ এখনও তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে না। সত্যাগ্রহের পক্ষে ইহা দুর্ব্বলতা, ইহাই আমার মনে হয়; কারণ একদিকে যেমন কয়েকজন ভারতবাসী কয়েদী চুরি করিয়া লুকাইয়া, যেমন করিয়া হউক, ভিক্ষা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে কোন বিপদেও পড়িতে হইত না, তেমনি অন্য দিকে কয়েকজন ভারতীয় কয়েদী যাহা দেওয়া হইত তাহাই খাইতেন এবং আপন বিপদের কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিতেন। যাঁহারা বাহিরে বাহিরে ছিলেন তাঁহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যদি আমরা সত্যভাবে কর্ম্ম গ্রহণ করি এবং অন্যায়কে আঘাত করি তবে এরূপ কষ্ট সহিতেই হয় না। স্বার্থ ছাড়িয়া পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে দুঃখের ঔষধ সহজেই পাওয়া যায়।

কিন্তু এই প্রকার দুঃখের প্রতীকার যেমন প্রয়োজন তেমনি অন্য একটি কথা চিন্তা করাও অত্যন্ত আবশ্যক। কয়েদী হইলে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। যদি কষ্টই না হইবে, তবে জেল কিসের জন্য? যে

আপনার হৃদয়কে অধীনে রাখিতে পারে তাহার পক্ষে ত জেলেও আনন্দে বাস করা সম্ভব। তাই কয়েদী একথা কখনই ভোলে না যে, জেলখানায় কষ্ট পাইতে হইবে আর অন্যেরও একথা ভুলিলে চলিবে না। তাহা ছাড়া আমাদের আচার ব্যবহার এমনি ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, তাহাতে বেশী কিছু পরিবর্ত্তন করিতে না হয়। 'যেমন দেশ তেমন বেশ', এই কথা ত প্রচলিতই আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিয়া আমার অভ্যাস এমনি হওয়া চাই যে এখানকার অন্ন জল আমার সহিয়া যায়। 'পূপূ' গমের মতই ভাল সাদা সিধা খাদ্য, তাহার কোন স্বাদ নাই একথাও বলা চলে না। কখন কখনও 'পূপূ' গম অপেক্ষাও ভাল লাগে। আমার মতে যে দেশে থাকা যায়, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সেখানকার উৎপন্ন অন্ন (অবশ্য নিতান্ত মন্দ না হইলে) গ্রহণ করা উচিত। অনেক শ্বেতাঙ্গ 'পূপূ' পছন্দ করেন এবং সকালে নিত্য তাহাই খাইয়া থাকেন। 'পূপূ'র সহিত দুধ, চিনি বা ঘি দিলে ত তাহা খাইতে চমৎকার লাগে। এই কারণে এবং আমাদিগকে আবার এখনই জেলে যাইতে হইবে এই ভাবিয়া, 'পূপূ' খাওয়া অভ্যাস করা আমাদের উচিত। প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ অভ্যাস করা একান্ত দরকার। এরূপ হইলে আবার কখনও 'পূপূ' খাইবার দরকার হইলে আর তাহা খারাপ লাগিবে না। দেশের জন্য অনেক অভ্যাসই আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া উপায় নাই। যে যে জাতি বড় হইয়াছে তাহারা যাহা হানিকর নহে, তাহ বিশেষ মহত্বপূর্ণ না হইলেও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মুক্তি ফৌজের লোকদের (Salvation Army) দেখুন, তাহারা যে দেশে যায় সেই দেশের রীতি নীতি বেশ ভূষা যদি খারাপ না হয় তবে গ্রহণ করিয়া সেখানকার লোকদের মন আকর্ষণ করিয়া লয়।

রোগী।

আমাদের দেড়শত কয়েদীর মধ্যে যদি একজনেরও অসুখ না হইত তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কথা হইত বটে। আমাদের মধ্যে মিঃ সমুন্দর খাঁ প্রথম রোগী। তিনি যখন জেলে আসিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার অসুখ, তিনি হাঁসপাতালে গেলেন। মিঃ কডবার সন্ধিবাতের রোগ ছিল। তিনি অনেক দিন জেলের মধ্যেই মলম ইত্যাদি ঔষধ ডাক্তারের নিকট হইতে লইলেন। কিন্তু পরে তিনিও হাঁসপাতালে গেলেন। দুইজন কয়েদীর মাথাঘোরা রোগ ছিল। তাঁহারাও হাঁসপাতালে গেলেন। সেখানকার বাতাস বড় গরম। কয়েদীদিগকে রৌদ্রে পড়িয়া থাকিতে হইত। তাহাতে কাহারও কাহারও মাথা ঘুরিত। তাহাদের সেবা শুশ্রূষা যথেষ্ট হইত। শেষাশেষি মিঃ নবাব খাঁও অসুখে পড়িলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দুধ ইত্যাদি দিবার আজ্ঞা দিলেন। তখন তিনি কিছু সারিয়া উঠেন। যাহা হউক, আমাদের সত্যাগ্রহী কয়েদীদের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই ছিল।

স্থানের অল্পতা।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি, যে কুঠুরীতে আমাদের রাখা হইয়াছিল তাহাতে মাত্র ৫১ জনের জন্য স্থান ছিল। বারান্দাও এতগুলি লোকের উপযুক্ত ছিল। কিন্তু যখন ৫১ জনের পরিবর্ত্তে ১৫১ জনেরও বেশী কয়েদী হইল তখন আমাদের অতি কষ্টে পড়িতে হইল। গভর্ণর বাহিরে ঘর তুলিয়া দিলে অনেক কয়েদী সেখানেই থাকিতে লাগিল। শেষাশেষি ১০০ জন

বাহিরে শুইতে যাইত। কিন্তু তাহারা সকালে আবার ফিরিয়া আসিলে বারান্দা ভরিয়া যাইত। একটুও যায়গা থাকিত না। এই অল্প স্থানে কয়েদীদের থাকিতে অতি কষ্ট হইত। তাহা ছাড়া নিজ নিজ অভ্যাস মত লোকে এধারে ওধারে থুতুও ফেলিত। তাহাতে দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িত এবং অসুখ হইবার ভয়ও থাকিত। সৌভাগ্য এই যে আমি বুঝাইয়া দিলে লোকে শুনিত এবং বারান্দা পরিষ্কার করিবার সময় তাহারা আমাদের সহায়তা করিত। যাহাতে কাহারও রোগ না হয় সেই জন্য বারান্দা ও পায়খানা পরিষ্কার করার উপর আমাদের খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এতগুলি কয়েদীকে এই অল্প স্থানে রাখা সরকারের অন্যায়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্থান যখন অল্প তখন সরকারের কর্ত্তব্য ছিল যে সেখানে যেন এত কয়েদী না পাঠান হয়। যদি এই আন্দোলন বেশী দিন এবং বেশী জোরে চালান যাইত, তাহা হইলে সরকার কখনই বেশী কয়েদীদের একত্র জড় করিতে পারিতেন না।

পঠন পাঠন।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে গভর্ণর আমাদিগকে জেলে টেবিল দিবার হুকুম দিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দোয়াত কলমও পাওয়া গিয়াছিল। জেলের সংশ্লিষ্ট একটী লাইব্রেরীও ছিল। কয়েদীরা সেখান হইতে পুস্তক পাইত। সেখান হইতে আমি কার্‌লাইলের গ্রন্থ এবং বাইবেল লইয়াছিলাম। এক জন চীনা দ্বিভাষী ছিলেন তিনি প্রথমেই ইংরেজী কোরাণ শরিফ; হক্সলের বক্তৃতা; বার্ণস, জন্‌সন্‌ এবং স্কটের জীবনী (কার্‌লাইলকৃত) এবং বেকনের নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লইয়া রাখিয়াছিলেন। আমার নিজের পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার কাছে ছিল। মনিলাল নাথুভাই কৃত টীকাসমেত গীতা, কয়েকখানা তামিল পুস্তক, মৌলবী সাহেব

প্রদত্ত উর্দ্দু পুস্তক, টলষ্টয়ের লেখাবলী, রাস্কিন ও সক্রেটিসের প্রবন্ধ। ইহার মধ্যে অনেক গ্রন্থই আমি জেলে প্রথমবার বা পুনর্ব্বার পড়ি। তামিল নিয়মিত ভাবে পড়া হইত। সকালে গীতা এবং দ্বিপ্রহরে কোরাণ সরিফ বেশী করিয়া পড়িতাম। সন্ধ্যায় মিঃ ফোরটুনকে বাইবেল পড়াইতাম। মিঃ ফোরটুন চীনা ক্রিশ্চান। তিনি ইংরাজী পড়িতে চাইতেন, তাই তাঁহাকে বাইবেলের সাহায্যে ইংরাজী পড়াইতাম। যদি পুরা দুই মাস জেলে থাকিতে হইত, তবে কার্লাইল ও রাস্কিনের পুস্তক অনুবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল। হাঁ, আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে এই সব পুস্তকের মধ্যে আমি মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতাম। তাই যদি আমার আরও দুই মাসের কারাবাসের দণ্ড মিলিত তবে আমি শুধু যে দুঃখিত হইতাম না তাহা নহে, বরং ততদিন আমি আমার জ্ঞান অনেক খানি বাড়াইতে পারিতাম এবং পূর্ণ সুখে কাটাইতাম। আর আমি একথাও মানি যে, যাহারা ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে চায় তাহাদের কোথাও অভাব হয় না। আমি ছাড়া কয়েদী ভাইদের মধ্যে পড়িতে ভাল বাসিতেন মিঃ সি, এম, পিল্লে, মিঃ নায়ডু এবং চীনা ভদ্রলোকগুলি। নায়ডু দুই জন গুজরাতী পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে কয়েকখানা গুজরাতী গানের বই আসিল। অনেকে তাহা পড়িতে আরম্ভ করিল কিন্তু আমি এসব পড়িতে বলি না।

ড্রিল।

জেলে ত আর সমস্ত দিন পড়া যায় না, আর তাহা সম্ভব হইলেও তাহাতে ক্ষতিই হইবার কথা। তাই অনেক হাঙ্গামা করিয়া গবর্ণর ও দারোগার নিকট হইতে আমরা যে ড্রিল ও ব্যায়াম করিতে পারি তাহার অনুমতি নিলাম। দারোগা লোকটী অতি ভাল ছিলেন। তিনি খুব

আনন্দের সহিত সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে ড্রিল শিখাইতেন। ইহাতে খুব লাভ হইত। ড্রিল শিখাইবার ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইলে আমাদের সকলের অনেক উপকার হইত। কিন্তু ভারতীয় কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দারোগার কাজও বাড়িয়া গেল, বারান্দার যায়গাও কম হইল, এইজন্য ড্রিল করা বন্ধ হইল। তথাপি মিঃ নবাব খাঁ সঙ্গে ছিলেন, এই কারণে ঘরোয়া ভাবে তাঁহার নিকটেই ড্রিল শিক্ষা হইত। ইহা ছাড়া গভর্ণরের পরোয়ানা অনুসারে আমরা সেলাইয়ের কল চালাইবার কাজও আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমরা কয়েদীদের ঝুলি বানাইতে শিখিয়াছিলাম। মিঃ টী, নায়ডু এবং মিঃ ইষ্টণ এই কর্ম্মে নিপুণ ছিলেন তাই তাঁহারা তাড়াতাড়ি শিখিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তেমন দক্ষতা লাভ করিতে পারি নাই, আমি ভাল করিয়া শিখিতে পাই নাই। একবার অনেক কয়েদী আসিয়া পড়িল, কাজের ভাগও অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন মানুষ ইচ্ছা করিলে "জঙ্গলে মঙ্গল" অর্থাৎ বনে বসিয়াও ভাল কাজ করিতে পারে। এইরূপে এক কাজের পর অন্য কাজে হাত দিতে থাকিলে কোন কয়েদীরই জেলের 'সময় কাটে না' বলিয়া মনে হইবে না, এমন কি সে নিজের জ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সেখান হইতে বাহির হইতে পারিবে। অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, জেলখানায় ভাগ্যবান লোকে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া সারিয়াছেন। জন বানিয়ান গুরুতর কারাক্লেশ সহ্য করিয়া জগতে অমর গ্রন্থ "পিলগ্রীমস্ প্রগ্রেস্ বা যাত্রিকের গতি" লিখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজেরা বাইবেলের পরে এই গ্রন্থেরই সমধিক আদর করে। লোকমান্য তিলক যখন বোম্বাইতে নয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিতে ছিলেন তখনই "ওরায়ন" নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সুতরাং জেলেই হউক আর অন্যত্রই হউক, সুখ মিলিবে কি দুঃখ মিলিবে, সুস্থ থাকিবে কি

রোগে ভুগিবে, তাহা অধিকাংশ স্থলে আমাদের নিজের মনের উপরেই নির্ভর করে।

দেখা সাক্ষাৎ।

জেলে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য অনেক ইংরাজ আসিতেন। এ বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রথম এক মাসের মধ্যে কেহই কোন কয়েদীর সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না। তাহার পর প্রতি মাসে এক রবিবার একজন আসিয়া দেখা করিয়া যাইতে পারে। বিশেষ কারণে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এবং মিঃ ফিলিপস্ এরূপ পরিবর্ত্তনে লাভবান হইয়াছিলেন। আমাদের জেলে যাওয়ার তিন দিনের দিন চীনা ক্রিশ্চান মিঃ ফোরটুনের সহিত দেখা করিবার জন্য মিঃ ফিলিপস্ অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হয়। মিঃ ফোরটুনের সহিত দেখা করিতে আসিয়া ভদ্রলোকটী আমার সহিত এবং অন্যান্য কয়েদীদের সহিতও দেখা করেন, এবং আমাদের সকলকে ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিবার কথা বলিয়া নিজের রীতি অনুসারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। এইরূপে মিঃ ফিলিপসের সঙ্গে তিনবার দেখা হয়। মিঃ ডেভিস্ নামে অন্য একজন পাদরীও আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। মিঃ পোলাক্ এবং মিঃ কোয়ান বিশেষ ভাবে অনুমতি নিয়া দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। শুদ্ধ আফিসের কাজে আসিবার জন্য তাঁহাদিগকে এই অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা এইরূপে দেখা করিতে আসিত তাহাদের সঙ্গে জেল দারোগা থাকিতেন, এবং তাঁহার সম্মুখে সমস্ত কথাবার্ত্তা চালাইতে হইত। ট্রান্সভ্যাল লীডারের সত্বাধিকারী মিঃ কার্টরাইট' বিশেষ অনুমতি নিয়া তিনবার আসিয়াছিলেন। তিনিও পরামর্শ করিবার

জন্যই আসেন, এই কারণে দারোগার অনুপস্থিতিতে আমার সহিত কথাবার্তা বলিবার বিশেষ আদেশ তিনি পাইয়াছিলেন। প্রথমবার কার্টরাইট সাহেব জানিয়া গেলেন যে ভারতীয়েরা কি চায়? কোন্ সর্ত্তে তাহারা রাজি হইতে পারে। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় তিনি অন্যান্য ইংরেজ ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া আনেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল একখণ্ড লেখা কাগজ— একরারনামা বা স্বীকার-পত্র। উহা আবশ্যকমত স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে মিঃ কবী, মিঃ নায়ডু এবং আমি তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিলাম। এই কাগজ এবং স্বীকার-পত্র বিষয়ে "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান" ও অন্যান্য কাগজে অনেক লেখালেখি হয়, সুতরাং এখানে সে বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। চীফ্ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্লেফোর্ডও একবার দেখা করিতে আসেন। তাঁহারও সর্ব্বদাই দেখা করিবার অধিকার ছিল। তবে তিনি বিশেষ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, কি আমাদের সকলকে জেলখানায় দেখিবার জন্য একবার আসিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না।

ধর্ম্মশিক্ষা

বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশে কয়েদীদের ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার প্রথা দেখা যায়। জোহান্সবার্গ জেলে কয়েদীদের জন্য পৃথক গীর্জ্জাঘর আছে। তাহাতে শুধু শ্বেতাঙ্গ কয়েদীই যাইতে পারে। আমি নিজের জন্য এবং মিঃ কোর্টুনের জন্য বিশেষ অনুমতি চাহিয়াছিলাম কিন্তু গবর্ণর বলিলেন, এ গীর্জ্জাঘরে শুধু শ্বেতাঙ্গ ক্রিশ্চানেরই প্রবেশাধিকার আছে। প্রত্যেক রবিবার শ্বেতাঙ্গ কয়েদীরা সেখানে যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন পাদরী ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে থাকেন। কাফ্রিদের জন্যও বিশেষ অনুমতি লইয়া অনেক

পাদরী আসেন। কাফ্রিদের নিজেদের কোন ধর্ম্মমন্দির নাই, তাই তাহারা জেলের ময়দানেই বসিত। ইহুদিদের জন্য তাহাদের পাদরী আসিতেন। কিন্তু হিন্দুমুসলমানের জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই। অবশ্য ভারতীয় কয়েদীর সংখ্যা এখানে বড় বেশীও নয়, তথাপি তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য জেলে কোনও বন্দোবস্ত নাই ইহা তাহাদের হীনতারই পরিচয়। যতক্ষণ একটীও ভারতীয় কয়েদী থাকে, ততক্ষণ এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া দুই জাতির ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা চাই। যে মৌলবী ও যে হিন্দুধর্ম্মীগুরু এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহাদের পবিত্রহৃদয় হওয়া দরকার নতুবা শিক্ষার কুফল হওয়াই সম্ভব।

শেষকথা।

যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহার অধিকাংশই উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। জেলখানায় ভারতীয়দিগকে কাফ্রিদের সঙ্গে একত্র রাখা হয় এবং একত্র গোনা হয়, একথা ভাবিয়া দেখা দরকার। শ্বেতাঙ্গ কয়েদীদের শুইবার খাটিয়া জোটে, দাঁত মাজিবার দাঁতন, নাকমুখ সাফ্ করিবার তোয়ালেও তাহারা পায়। অন্যান্য কয়েদীদের ভাগ্যে এসব কেন জোটে না, তাহা খোঁজ করিয়া দেখা দরকার। "এ সব খবরে আমার কি প্রয়োজন, আমি মাথা ঘামাইতে যাই কেন" একথা মনে করা উচিত নয়। বিন্দু বিন্দু মিশিয়া সিন্ধু হয়। এই প্রবাদ অনুযায়ী বলিতে পারা যায়, অতি সামান্য কথায়ও নিজের মান বাড়ে এবং কমে। "যাহার মান নাই তাহার ধর্ম্মও নাই" আরবী গ্রন্থে এমনধারা একটা কথা আছে, আর ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ধীরে ধীরে নিজের মান বাড়িলে তবেত জাতীয় মর্য্যাদা বাড়িতে পারে। মানের অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ভয় অথবা আলস্যের বশে আপন

অভীষ্ট যেন না হারাই—মনের এইরূপ ভাব এবং সেই অনুযায়ী চেষ্টাকে প্রকৃত মান বলে। পরমেশ্বরে যাহার স্থির বিশ্বাস, ভগবান যাহার অবলম্বন সেই ব্যক্তিই এই মান পাইতে পারে। আমি শুধু বলিতে চাই এবং আমার কথা বাস্তবিক সত্যও বটে যে—যাহার মধ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধা নাই, যে বাস্তবিক শ্রদ্ধাবান্ নয়, তাহার পক্ষে কোনও বিষয়ে সত্যজ্ঞান লাভ করা বা সত্য সত্য কোন কর্ম্ম সম্পাদন করা অসম্ভব।

(দ্বিতীয় বার)

প্রস্তাবনা।

জানুয়ারী মাসে আমার একবার জেল হইয়াছিল। সেবারকার অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আমার মনে হয় এবারের অনুভূতি অনেক সুন্দর। আমি ইহা হইতে অনেক শিক্ষাই লাভ করিয়াছি। আমার মনে হয়, আমার এই অনুভূতি অন্য ভারতবাসীর পক্ষেও উপযোগী।

সত্যাগ্রহ সংগ্রাম—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—অনেক ভাবেই করা যায়। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় দুঃখ দূর করিবার উপায় শুধু জেল। আমার মনে হয়, আমাদের বার বার জেলে যাইতে হইবে। ইহা শুধু এই আন্দোলনের জন্য নয়, উপরন্তু ভবিষ্যতে অন্যান্য বিপদ আসিতে পারে, তাহার প্রতীকারেরও উত্তম উপায়। অতএব জেলের বিষয় যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা হিন্দুস্থানবাসীদের জানা কর্ত্তব্য।

গ্রেপ্তার।

যখন মিঃ সোরাবজী জেলে গেলেন, তখন মনে হইল যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও চলিয়া গেলে ভাল হয়; নতুবা যেন তাঁহার কারামুক্তির আগেই এ আন্দোলন সার্থক হইয়া উঠে। আমার আশা ব্যর্থ হইল। কিন্তু যখন নেটালের বীর নেতৃবৃন্দ জেলে গেলেন, তখন আবার এই ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল এবং পরে তাহা পূর্ণ হইল। ডারবান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ৭ই অক্টোবর আমি বোকসরষ্ট ষ্টেসনে ধৃত হইলাম, কারণ আমার কাছে আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট ছিল না এবং আমি আঙ্গুলের টিপসহি দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম।

ট্রান্সভালের প্রাচীন হিন্দু অধিবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা নেটালে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার উদ্দেশ্যেই আমি ডারবানে গিয়াছিলাম। আশা ছিল যে নেটালের নেতৃবৃন্দের অভাবে অনেক ভারতীয়ই সেখান হইতে আসিতে প্রস্তুত হইবেন। সরকারেরও এই ভয় ছিল। তাই বোকসরষ্টের জেলার, একশতের অধিক ভারতীয় কয়েদীর জন্য ব্যবস্থা করিবার আদেশ পাইয়াছিল। তদনুসারে প্রিটোরিয়া হইতে তাঁবু, কম্বল, বাসন ইত্যাদিও পাঠান হইয়াছিল। যখন আমি অনেকগুলি ভারতবাসীর সহিত বোকসরষ্টে নামিলাম, তখন আমার সহিত অনেক পুলিস ছিল, কিন্তু তাহাদের সকল দৌড় ধাপ ব্যর্থ হইল। জেলার ও পুলিসকে নিরাশ হইতে হইল, কারণ ডারবান হইতে আমার সঙ্গে অতি অল্প ভারতবাসীই আসিয়াছিলেন। সেই গাড়ীতে মাত্র ৬ জন ছিলেন, এবং সেই দিন অন্য ট্রেণে আরও ৮ জন আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ সর্ব্ব-সমেত ১৪ জন ভারতবাসী আসিয়াছিলেন। সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া জেলে লইয়া যাওয়া হইল। দ্বিতীয় দিন আমাদের সকলকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু মোকদ্দমা ৭ দিনের জন্য মুলতুবী করিয়া দেওয়া হইল। বলদের উপর বসিয়া যাইতে আমরা অস্বীকার করিয়াছিলাম। দুই দিন পরে মিঃ ভাওজী করসণজী কোঠারী আসিলেন। তিনি অর্শ রোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন। অসুখ বাড়িয়া ওঠাতে এবং বোকসরষ্টে পিকেটীং এর প্রয়োজন বোধে তিনি জামিন দিয়া খালাস হইলেন।

জেলে আমাদের অবস্থা।

আমরা যখন জেলে পৌঁছিলাম, তখন মিঃ দাউদ মহম্মদ, মিঃ রুস্তমজী, মিঃ আঙ্গলিয়া (যাঁহার সহায়তায় এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আরম্ভ),

মিঃ সোরাবজী, অড়াচনীয়া প্রভৃতি অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ মিলিয়া প্রায় ২৫ জন ছিলাম। তখন রমজানের মাস। সুতরাং মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ রোজা পালন করিতেছিলেন। তাঁহাদের জন্য বিশেষ অনুমতি লইয়া সন্ধ্যাবেলায় মিঃ ইসপ সুলেমান কাজীর বাড়ী হইতে খাদ্য আসিত। এইজন্য তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত রোজা পালন করিতে পারিয়াছিলেন। বাহিরের জেলে আলোর বন্দোবস্ত ছিল না। তাই রমজানের জন্য আলো ও ঘড়ী রাখিবার অনুমতি পাওয়া গেল। সকলেই মিঃ আঙ্গলিয়ার পরে নমাজ পাঠ করিতেন। প্রথমে রোজারক্ষণকারীদেরও পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাঁহাদের আর এরূপ কাজ করিতে হয় নাই।

অবশিষ্ট যে কয়জন ভারতবাসী কয়েদী ছিলেন তাঁহাদের আপনাদের খাদ্য রন্ধন করিবার অনুমতি ছিল। সুতরাং মিঃ উমিয়াশঙ্কর শেলত ও মিঃ সুরেন্দ্র নাথ মেড়ে, এই দুইজনকে এই কাজের ভার দেওয়া হইল। পরে কয়েদীদের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে তখন মিঃ জোশীকে সঙ্গে দেওয়া হইল। ইঁহারা যখন দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন তখন এই কাজ মিঃ রতণজী সোঢ়া, মিঃ রাঘবজী, এবং মিঃ মাওজী কোঠারীকে করিতে হইল। পরে যখন কয়েদী অনেক বাড়িয়া গেল, তখন মিঃ লাল ভাই এবং মিঃ উমর উসমানও এই কাজে লাগিলেন। রন্ধনকারীদের রাত ২।৩ টার সময় উঠিতে হইত এবং সন্ধ্যা ৫।৬ টা পর্য্যন্ত এই কাজে লাগিয়া থাকিতে হইত। যখন অধিকাংশ কয়েদীকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তখন রন্ধন করিবার ভার মিঃ মূসা ইউসফ, ইমাম সাহেব এবং মিঃ বাওয়াজীর লইলেন। যিনি ভারতীয় আহমদীয়া ইস্‌লামিক সোসাইটীর সভাপতি এবং বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং যাঁহার কোন দিনই রুটী তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহার হাতের অন্ন এই ভাবে যে পাইয়াছিল তাহাকে আমি ধন্য বলিয়া মনে করি। যখন ইমাম সাহেব এবং তাঁহার সঙ্গী মুক্তি

পাইলেন তখন সে সৌভাগ্য আমার হইল। আমার একাজে অল্প সল্প অভ্যাস ছিল, সুতরাং কোন বিপদে পড়িতে হয় নাই। চারি দিন পর্য্যন্ত এ কাজ আমার হাতে ছিল, তাহার পর মিঃ হরিলাল গান্ধী এই ভার গ্রহণ করিলেন।

যখন প্রথম জেলে যাই তখন সেখানে শয়ন করিবার তিনটী মাত্র কুঠুরী ছিল। তাহারই মধ্যে ভারতবাসীদের একত্র রাখা হইত। এই জেলে ভারতবাসী ও কাফ্রিদের আলাদা রাখা হইত।

জেলের ব্যবস্থা।

পুরুষদের জেলে দুইটী বিভাগ ছিল। একটী ইউরোপীয়দের জন্য; তাহাতে যাহারা গোরা বা শ্বেতাঙ্গ নহে তাহাদের রাখা হইত। জেলার ভারতীয় কয়েদীগণকে কাফ্রিদের সহিত একত্র রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহাদের ব্যবস্থা শ্বেতাঙ্গদের বিভাগেই করিয়াছিলেন। কয়েদীদের জন্য ছোট ছোট কুঠুরী, এবং প্রত্যেক কুঠুরীতে ১০।১৫ বা ততোধিক জনের থাকিবার স্থান। সমস্ত জেলখানা পাথর দিয়া তৈয়ারী, কুঠুরীগুলিও উঁচু। দেওয়ালে পেলেস্তারা দেওয়া ছিল, ফরাস সর্ব্বদা ধোয়া হইত, তাই তাহা খুব পরিষ্কার থাকিত। দেওয়ালে অনেকবার চূণকাম করা হইত বলিয়া সর্ব্বদাই নূতন মনে হইত। উঠান কাল পাথরে তৈয়ারী করা হইয়াছিল, তাহাও সর্ব্বদা ধোয়া হইত। উঠানেই ছিল স্নানের ঘর। তিন জনে এক সঙ্গে বসিয়া স্নান করিতে পারে এমন যায়গা সেখানে ছিল। দুইটী পাইখানা ছিল। বসিবার জন্য দুইটী বেঞ্চ। যাহাতে কয়েদী উপরে উঠিতে না পারে সে জন্য কাটাওয়ালা তারের জাল উপরে ছিল। প্রত্যেক কুঠুরীতেই বাতাস ও আলো ভাল ভাবে চলাচল করিতে পারিত। সন্ধ্যা ছয়টার

সময় কয়েদীদের বন্ধ করা হইত, এবং সকালে ছয়টার সময় দরজা খুলিয়া দেওয়া হইত। দরজায় তালা দেওয়া হইত, সুতরাং কোন কয়েদীর পায়খানা ইত্যাদি যাইবার প্রয়োজন হইলেও বাহিরে যাইতে পারিত না। কুঠরীর ভিতরেই এই কাজ সারিবার জন্য ফিনাইল দেওয়া পাত্র রাখা হইত।

আহার।

আমি বোকসরেষ্টের জেলে গিয়া দেখিলাম, ভারতীয় কয়েদীরা প্রাতে 'পুপু' ও দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় ভাত ও তরকারী পাইত। তরকারীর মধ্যে আলুই বেশীর ভাগ। ঘির সহিত মোটেই সম্পর্ক ছিল না। যাহারা বিনাশ্রমে দণ্ডিত হইয়া জেলে ছিল তাহারা পূর্ব্বোক্ত আহার্য্য ছাড়া প্রাতে 'পুপু'র সঙ্গে এক আউন্স চিনি ও দ্বিপ্রহরে কিছু রুটি পাইত। বিনাশ্রমে দণ্ডিত কয়েদীদের অনেকেই সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত কয়েদীদিগকে আপনাদের চিনি ও রুটি হইতে কিছু কিছু ভাগ দিত। কয়েদীদের দুই দিন মাংস খাইবার কথা, কিন্তু তাহাতে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও লাভ হইত না, সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের অন্য কিছু পাওয়া উচিত ছিল এবং ইহার জন্য আমরা আবেদন করিয়াছিলাম। তাহার পর হইতে মাংসের দিনে আমরা এক আউন্স ঘি ও কিছু 'বীন' পাইতে লাগিলাম। তাহা ছাড়া জেলের বাগানে একপ্রকার তরকারি আপনা হইতে হইত, তাহা ব্যবহার করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল। সময় সময় বাগান হইতে পিঁয়াজও আনিবার সুবিধা দেওয়া হইত। সুতরাং ঘি ও 'বীন' পাওয়ার পরে আমাদের আহার সম্বন্ধে আর উল্লেখযোগ্য কোন অভিযোগ থাকিল না। জোহান্সবর্গের জেলে ভোজনের অন্য প্রকার ব্যবস্থা;

তরকারী দেওয়া হইত না, সন্ধ্যায় দুই দিন সব্‌জী ও 'পূপূ' পাওয়া যাইত, তিন দিন বীন্, একদিন আলু ও 'পূপূ'।

এই আহার নিজেদের রীতি অনুযায়ী না হইলেও সাধারণ ভাবে ইহাকে মন্দ বলা চলে না। অনেক ভারতবাসীর 'পূপূ' ভাল লাগিত না, এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই খাইতেন না। কিন্তু আমার মনে হয় এটা খুব ভুল। "পূপূ" মিঠা ও পুষ্টিকর খাদ্য। গমের পরিবর্ত্তে উহাকে এদেশে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাতে আবার চিনি দিলে চমৎকার স্বাদ হয়। কিন্তু বিনা চিনিতেও ক্ষুধা থাকিলে খুবই মিষ্ট লাগে। 'পূপূ' খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত ভোজনে আর কেহ অতৃপ্ত থাকে না, সকলেরই ক্ষুধা নিবারণ হয়। শুধু তাহাই নহে, তাহাতে শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হয়, সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া নিলে ইহাতেই ভরপেট খাওয়া হয়। দুঃখের বিষয় ত ইহাই যে, আমরা এরূপ বাবু হইয়া উঠিয়াছি এবং আমাদের অভ্যাস এরূপ হইয়া গিয়াছে যে যদি কোথাও নিজেদের অভ্যাসমত খাবার না জুটিল ত মেজাজ গেল বিগ্‌ড়াইয়া। বোক্‌সরষ্ট জেলে আমার এই অভিজ্ঞতা হইল; ইহাতে মনে বড় ব্যথা পাইলাম। ভোজন লইয়া বিবাদ ত সর্ব্বদাই উঠিত, আর "অন্নই জীবন নহে, খাওয়ার জন্যই বাঁচিয়া আছি এমনও নহে"—এরূপ কথা প্রায়ই হইত। সত্যাগ্রহীদের এরূপ গণ্ডগোল করা উচিত নহে; আহার পরিবর্ত্তন করা নিজের কাজ। পরিবর্ত্তন না হইলে যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া গবর্ণমেন্টকে দেখান চাই যে আমরা কোনও ক্ষেত্রেই পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহি। ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য। অনেক ভারতবাসীই খাদ্যের অসুবিধার জন্যই জেলে যাইতে ভয় পান। তাঁহাদের উচিত, বিচারপূর্ব্বক আপনাদের ভোজনলালসা সংযত করা।

সশ্রম কারাদণ্ড

পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের সকলের মোকদ্দমা সাত দিন পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল, অর্থাৎ ১৪ই অক্টোবর মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। তখন কয়েকজনার এক মাস ও কয়েকজনার আট সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড, এই হইল বিধান। একটি ১১ এগার বছরের ছেলে ছিল, তাহাকেও "১৪ দিন বিনাশ্রমে কারাবাস" এই দণ্ড দেওয়া হইল। আমার ভয় হইল, পাছে আমার নামে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হয়। এই ভাবিয়া আমি চটিয়া উঠিলাম। আর সকলের বিচার শেষ হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট অল্পক্ষণের জন্য বিচারকর্ম্ম স্থগিত রাখিলেন। তাহাতে আমি আরও চিন্তান্বিত হইলাম। প্রথমে ত মনে হইতেছিল, আমার উপরে লাইসেন্স না দেখানের ও আঙ্গুলের টীপসহি না দেওয়ার অভিযোগ আনা হইবে; শুধু তাহাই নয়, অন্যান্য ভারতবাসীদের ট্রান্সভালে লইয়া যাওয়ার অপরাধও তাহার সহিত যোগ করা হইবে। মনে মনে এই কথা লইয়া তোলপাড় করিতেছিলাম এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট আবার আদালতে আসিলেন, এবং আমার মোকদ্দমা আবার আরম্ভ হইল। আমার ২৫ পাউণ্ড জরিমানা দণ্ড হইল, জরিমানা অনাদায়ে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ইহাতে আমি খুব খুসী হইলাম এবং নিজকে ভাগ্যবান মনে করিলাম, কারণ অন্যান্য ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত একত্রে বাস করিবার সৌভাগ্য এইরূপে আমার হইল।

পরিচ্ছদ।

দণ্ডাদেশ হইবার পর আমাদের জেলের পোষাক পরান হইল। একটা ছোট মজবুত জাঙ্গিয়া, খদ্দরের একটি শার্ট, তাহা ছাড়া একখানি কাপড়, একটি টুপি, তোয়ালে একটি, মোজা আর স্যাণ্ডাল—এইগুলি পাওয়া

গেল। আমার মনে হয়, এই পোষাক কাজ করিবার সময়ে খুব উপযোগী ; সাদাসিধাও বটে, আর টিকেও বেশী দিন। এরূপ কাপড় সম্বন্ধে আমাদের উল্লেখযোগ্য কোনই অভিযোগ ছিল না। সব সময় এননধারা পোষাক জুটিলেও কোন ক্ষতি নাই। শ্বেতাঙ্গদের পোষাক অন্যপ্রকার ; তাহারা 'বৈঠকদার' টুপি পাইত, হাঁটু পর্য্যন্ত মোজা, ও দুইটি তোয়ালে, তা' ছাড়া রুমালও তাহাদের দেওয়া হইত। ভারতবাসীদের জন্যও রুমাল দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

কাজ।

যে সকল কয়েদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দিয়া দৈনিক নয় ঘণ্টা কাজ করাইয়া লইতে পারেন। কয়েদীদের প্রত্যহ ৬টার সময়ে কুঠুরীতে বন্ধ করা হইত। সকালে ৫॥টায় উঠিবার ঘণ্টা বাজিত, আর ৬টায় কুঠুরীর দরজা খুলিত। কুঠুরীতে বন্ধ করিবার ও বাহির করিবার সময় কয়েদী গোণা হইত। যাহাতে গোণার কাজ শীঘ্র ও ঠিক ভাবে হইয়া যায়, সেজন্য প্রত্যেক কয়েদীর উপর নিজ নিজ বিছানার পাশে সাবধানে দাঁড়াইয়া থাকিবার আদেশ ছিল। প্রত্যেককেই ৬টা বাজিবার আগে বিছানা গুটাইয়া হাত মুখ ধুইয়া তৈয়ারী থাকিতে হইত। সাতটার সময় কাজে হাজির হওয়ার কথা। কাজ ছিল নানারকমের। প্রথমদিন ত আমরা সদর রাস্তার উপর কতকটা খোলা জমি খুঁড়িবার কাজ পাইলাম। এই জমি বাগানের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছিল ; আমাদের প্রায় ত্রিশ জন ভারতবাসীকে এই কাজে লাগান হইল। কোনও ব্যক্তি কাজ করিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে আর কাজে যাইতে হইত না।

কাফ্রিদের সঙ্গে একত্র আমাদিগকে লইয়া গেল। জমি খুব শক্ত, তাহা কোদাল দিয়া খুঁড়িতে হইবে। কাজটা ছিল বেশ কঠিন, রৌদ্রও বেশ প্রখর। ছোট জেল হইতে জায়গাটা প্রায় দেড় মাইল দূরে। ভারত-বাসীরা সকলে বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে চট্ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন, কিন্তু অভ্যাস নাই—তাই সকলেই খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বাবু তালেবন্ত সিংহের পুত্র রবিকৃষ্ণও এই দলে ছিল। তাহাকে কাজ করিতে দেখিয়া আমার মন ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার পরিশ্রম দেখিয়া আমি আনন্দও পাইতেছিলাম। দিন যেমন বাড়িতে লাগিল, কাজের ভারও তেমনই শক্ত মনে হইতে লাগিল। ওয়ার্ডার ছিল একটু কড়া মেজাজের; সে সর্ব্বদা "চলাও, চলাও" চীৎকার করিতেছিল, তাহাতে ভারতবাসীরা একটু ভয় পাইয়া গেলেন। অনেককে ত আমি কাঁদিতে দেখিলাম। একজনের পা ফুলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তবু আমি সকলকেই বলিতেছিলাম—সকলেই এমন মন দিয়া কাজ কর যাহাতে দারোগার কথা বলিবার অবসরই না হয়। আমি নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হাতে বড় বড় ফোস্কা পড়িয়া গেল, সেগুলি ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঝুঁকিতে কষ্ট হইতেছিল, কোদালও ভারি বোধ হইতে লাগিল। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, আমার মুখ রক্ষা কর; আমাকে এমন বল দাও যেন আমি অসমর্থ না হইয়া বরাবর কাজ করিয়া যাইতে পারি। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিতাম। দারোগা আমাকে তাগাদা করিতে লাগিল। আমি ক্লান্ত হইলে সে কাজ করিতে বলিত। আমি তাহাকে বলিলাম, কিছু বলিবার দরকার নাই, আমি প্রাণপণে কাজ করিবার লোক ফাঁকিবাজ নহি। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ প্রাণপণ খাটিব। এই সময়ে দেখিলাম, মিঃ জিনাভাই দেশাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। জায়গা

হইতে নড়িবার হুকুম ছিল না, সুতরাং একটু দাঁড়াইলাম। দারোগা সেখানে গেল; আমার মনে হইল, আমার সেখানে যাওয়া উচিত। আমি দৌড়াইয়া গেলাম; আরও দুই জন ভারতবাসী আসিলেন। জিনাভাইএর মুখে জল ছিটাইয়া দিতে, তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দারোগা আর সকলকে কাজে পাঠাইয়া দিয়া আমাকে তাঁহার পাশে বসিতে দিল। জিনাভাইএর সর্ব্বাঙ্গে খুব জল ছিটাইলে পর তিনি সুস্থ বোধ করিলেন। আমি দারোগাকে জানাইলাম যে ইঁনি হাঁটিয়া জেলে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না; তখন গাড়ী আনান হইল। আমি তাঁহাকে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইলাম। জিনাভাইএর মাথায় জল দিতে দিতে আমার মনে হইল,—আমার কথায় বিশ্বাস রাখিয়া কত ভারতবাসীই না জেল খাটিতেছেন! যদি আমার পরামর্শ অন্যায় হয়, তবে কত বড় পাপী আমি! আমারই জন্য তাঁহাদিগকে এত দুঃখ সহিতে হইতেছে। এই ভাবিয়া আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম, এবং তর্কসমুদ্রে ডুব দিয়া হাসিমুখে বাহির হইলাম। আমার মনে হইল, আমি যে পরামর্শ দিয়াছি তাহা ন্যায়সঙ্গতই বটে। দুঃখ ভোগেই সুখ, দুঃখের জন্য বিরক্ত হইলে চলিবে না। এখন ত শুধু মূর্চ্ছা হইল, যদি মৃত্যুও আসে তবু আমি যে পরামর্শ দিয়াছি তাহা ছাড়া অন্য পরামর্শ দিতে পারিব না। গর্ভযন্ত্রণার চেয়েও বড় এই দুঃখ ভোগ করিয়াই শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করা কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া আমি শান্তি পাইলাম, এবং জিনাভাইকে সাহস ও ভরসা দিতে লাগিলাম।

গাড়ী আসিলেই জিনাভাইকে তাহাতে শোয়ান হইল; গাড়ি ছাড়িয়া দিল। বড় দারোগার কাছে কথা উঠিল, তখন ছোট দারোগার চেতনা হইল। দ্বিপ্রহরে জিনাভাইকে কাজে আনা হইল না এবং আরও তিনজন

ভারতবাসীকে ঐরূপ দুর্ব্বল মনে করিয়া ছুটী দেওয়া হইল। বাকী সকলে কাজে আসিলেন। দ্বিপ্রহরে বারোটা হইতে একটা পর্য্যন্ত খাইবার সময়। একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইত। দ্বিপ্রহরে আমাদের দেখিবার ভার শ্বেতাঙ্গের বদলে কাফ্রি দারোগার উপরে পড়িল। সে শ্বেতাঙ্গ দারোগার চেয়ে ভাল ছিল, বেশী তাগাদা করিত না, মাঝে মাঝে একটু আধটু বলিত। এই বেলা, অর্থাৎ দুপ্রহরে, কাফ্রি ও ভারতবাসীকে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাখা হইল। আমাদিগকে একটু নরম জমি খুঁড়িতে দেওয়া হইল।

যে লোকটি এই কাজের কণ্ট্রাক্ট্ অর্থাৎ ঠিকা লইয়াছিল, তাহার সহিত আমার কথা হয়। সে বলিল, ভারতীয় কয়েদীদের কাজে তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সে স্বীকার করিল যে, একজন কাফ্রি একযোগে যতখানি শারীরিক শ্রম করিতে পারে একজন ভারতবাসী তাহা পারে না।

আমি বলিলাম, ভারতবাসীরা কোনও দারোগার ভয়ে কাজ করিবার লোক নহে। তাহারা ঈশ্বরের ভয়ে যতখানি পারিবে ততখানি কাজ করিবে। কিন্তু পরে আমার এই মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল; কারণ বলিতেছি।

দ্বিতীয় দিন আমাদের আবার কাজ করিতে বাহিরে আনা হইল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ দারোগার সঙ্গে নয়,—একজন কাফ্রি দারোগার সঙ্গে। সে আগের দিনের লোকটি নয়। এ লোকটিও বেশ ভাল ছিল, আমাদের কিছুই বলিত না।

আমরাও ভাল ছিলাম। কারণ শরীরে যতখানি কুলায় ততখানি কাজ করিতাম। আমাদের যে কাজ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ছিল সাধারণ রকমের। সদর রাস্তার উপর মিউনিসিপ্যালিটির জমিতে গর্ত্ত করিবার ও পুরাইবার কাজ ছিল, তাহাতে ক্লান্তি আসা সম্ভব। আমি অনুভব

করিতাম, ভগবান আমাদের সকল কাজের সাক্ষী। আমরা কাজ চুরী করিতেছিলাম, কারণ লোকদের কাজে ঢিল দেখা যাইতেছিল। আমার মতে, এরূপ ভাবে কাজে ফাঁকি দেওয়া আমাদের পক্ষে বড়ই কলঙ্কের কথা। আমাদের আন্দোলনে যে ঢিল পড়িতেছিল তাহার কারণও ইহাই। সত্যাগ্রহের পন্থা যেমন সরল তেমনি অরক্ষিত। আমাদিগকে সর্ব্বদা শুদ্ধ থাকিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত ত আমাদের শত্রুতা নাই, তাহাকে আমি শত্রু বলিয়া মনে করি না। সরকারের সহিত বিবাদের কারণ—তাহার ত্রুটি সংশোধন করিয়া অন্যায় দূর করা। আমি তাহার অমঙ্গলে প্রসন্ন হইব না, তাহার বিপক্ষতাচরণ করিবার সময়েও তাহার মঙ্গল চাহিব। এই বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যথাশক্তি আমাদের জেলে কাজ করা উচিত। যদি আমি বলি যে আমাকে দিয়া কাজ করানের নীতি আমি মানি না, সুতরাং যখন দারোগা দেখিব তখনই শুধু পুরা কাজ করিব, নতুবা নয়, তবে এ ভাব মনে হওয়া অনুচিত। যদি কাজ উচিত ও ন্যায়ানুমোদিত না হয় তবে দারোগাকে গ্রাহ্য না করাই উচিত। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ানই উচিত, এবং ইহার পরিণামে যদি দণ্ড বাড়িয়া যায় তবে তাহাও মাথা পাতিয়া লইব। কিন্তু কোন কোন ভারতবাসী একথা মানেন না। যে কাজ করে না সে শুধু কাজ এড়াইবার জন্যই এবং আলস্যবশতঃ কাজে ফাঁকি দেয়। এরূপ আলস্য ও কাজ চুরী আমাদের শোভা পায় না। সত্যাগ্রহী বলিয়া আমাকে যে কাজ দিবে তাহা আমার করা উচিত। আর যদি দারোগার দিকে না চাহিয়া কাজ করা যায় তবে কোনও কষ্টই হয় না। তাই কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্যই অনেকের জেলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।

এইবার আমি আসল কথায় অবতারণা করিব। এইরূপে দিনের পর দিন কাজ সহজ হইয়া আসিল। যে দলে আমি ছিলাম, তখন তাহার উপর

জেলের বাগান পরিষ্কার রাখিবার ও গাছ লাগাইবার ভার পড়িল। ভুট্টা লাগান, আলুর আল পরিষ্কার করা, ও মাটি দেওয়া—এই ছিল বেশীর ভাগ কাজ।

দুই দিন পরে মিউনিসিপালিটির পুকুর খুঁড়িবার জন্য আমাদিগকে পাঠান হইল। সেখানে মাটি খুঁড়িতে হইত, মাটির ঢিপি করিতে হইত, আর সে মাটি বহিয়া অন্যস্থানে আনিতে হইত। কাজটা শক্তই ছিল। দুই দিন পর্য্যন্ত সে কষ্ট আমরা পাইয়াছিলাম। কাজে লাগার পরে আমাদের শরীর ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু মাটিচিকিৎসায় তাহা সারিয়া গেল।

জায়গাটা জেল হইতে ৪।৫ মাইল দূরে। আমাদের ট্রলিতে করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। পুকুরের মধ্যেই খাবার তৈয়ারী করিতে হইবে, তাই আটা, বাসনপত্র ও কাঠ সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। এততেও ঠিকাদার খুসী নয়। আমরা কাফ্রিদের সমান কাজ করিতে পারিতাম না। দুই দিন খুব করিয়া পুকুরের কাজ করাইয়া লওয়া হইল, তার পর আমাদের অন্য কাজ দেওয়া হইল। এতদিন ব্যবস্থা ছিল যে, নানারকম কাজ করিতে পারিলেও ভারতবাসীদের একই কাজে লাগান হইবে। এবার হইতে তাহাদের কাজ অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। কেহ কেহ সৈনিকদের সমাধির পাশে ঘাস উঠাইয়া সাজাইবার জন্য চলিয়া গেলেন, অন্য সকলকে সমাধিক্ষেত্র পরিষ্কার রাখিবার কাজে নিযুক্ত করা হইল। এইভাবে কাজ চলিল। ইতিমধ্যে বয়টন মোকদ্দমার পর প্রায় ৫০ জন ভারতবাসী মুক্তি পাইলেন। তখন প্রায়ই আমাদিগকে বাগানের কাজ দেওয়া হইত। সেখানে মাটি কাটা, ফসল তোলা, জঞ্জাল একত্র করা—ইত্যাদি কাজ ছিল। এ কাজ শক্ত বোধ হইত না, এবং ইহাতে শরীরও ভাল হইত। একাধারে ৯ ঘণ্টা এই কাজ করিতে প্রথম প্রথম প্রাণ শেষ হইত, কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে বিশেষ কিছু কষ্টবোধ হইত না।

এই কাজ ছাড়াও, প্রত্যেক কুঠুরিতে প্রস্রাবের জন্য যে পাত্র ছিল তাহা উঠাইয়া আনিবার ভার আমাদের উপর পড়িয়াছিল। দেখিলাম, অনেকে একাজ করিতে ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু বাস্তবিক, ইহাতে ঘৃণা করিবার কিছু নাই। কাজ করিতে গিয়া লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করা ভুল। বিশেষ করিয়া কয়েদীর ত বিরক্তির অবকাশই নাই। প্রায়ই দেখিতাম, কুঠুরীর প্রস্রাবের পাত্র কে উঠাইবে তাহা লইয়া কথা উঠিত। যদি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল কথা আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গিয়া থাকে তবে আর এ প্রশ্ন উঠে না, বরং কে একাজ করিবে তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়ে। যাহার উপর এই কাজের ভার পড়ে তাহার নিজকে ধন্য মনে করা উচিত; অর্থাৎ এমন হওয়া উচিত যে, গবর্ণমেণ্ট জেলে আমায় এমন কাজ করিতে দিলে তাহাতে আমাদের মান সম্ভ্রমের কিছু হইবে না, বরঃ গবর্ণমেণ্টের বলার আগেই সে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকা সব চেয়ে ভাল। যখন কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, তখন একজনকে অন্যের চেয়ে বেশী কষ্ট পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে, এবং যাহার উপর সব চেয়ে বেশী কাজের ভার পড়িবে তাহার তাহাতে গৌরবই বোধ করিতে হইবে। মিঃ হাসান মির্জ্জা এই আদর্শ প্রচার করিলেন। তাঁহার ফুস্‌ফুসের রোগ ছিল, শরীরও বিশেষ দুর্ব্বল; তবু তাঁহাকে যখনই যে কাজ দেওয়া হইয়াছে সে কাজ তিনি খুসী হইয়া করিতেন। শুধু তাহাই নহে, নিজের রোগও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। একবার একজন কাফ্রি দারোগা তাঁহাকে বড় দারোগার পায়খানা পরিষ্কার করিতে বলিয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সে কাজ করিতে স্বীকার করিলেন। পূর্ব্বে তিনি কখনও একাজ করেন নাই, তাই একাজ করিতে করিতে তাঁহার বমি হইল, তবু তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। যখন তিনি অন্য একটি পায়খানা পরিষ্কার করিতেছিলেন, তখন আমি সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম; এ দৃশ্য দেখিয়া আমার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল,

আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইল। প্রশ্ন করিয়া প্রথম পায়খানা পরিষ্কার করার কথা জানিতে পারিলাম। একবার প্রধান দারোগা সেই কাফ্রি দারোগাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ করিয়া যে পায়খানা তৈয়ার করা হইয়াছে তাহা পরিষ্কার করার জন্য ভারতবাসীদের যেন লাগান হয়। দারোগা আমার কাছে আসিয়া দুই জন লোক চাহিল। আমি ত নিজে একাজ ভাল বলিয়াই মনে করিতাম, আমার এরূপ কাজ করিতে একটুও লজ্জা হয় না, তাই আমি গেলাম। আমার মতে, আমাদের এরকম কাজ করার অভ্যাস থাকা উচিত। আমরা এসব কাজ খারাপ মনে করি, তাই নিজেদের উঠান ও পায়খানার খারাপ অবস্থা অনেকবার আমাদের চোখে পড়ে; এমন কি, এইভাবেই মৃগী প্রভৃতি অনেক মন্দ রোগের সৃষ্টি বা বিস্তার আমাদের জন্য হয়। আমরা স্থির ধারণা করিয়া বসিয়াছি যে, পায়খানা খারাপ জায়গা, তাই সেখানকার দুর্গন্ধে আমরা দূষিত হই। এই সমস্ত কাজ না করার দণ্ডস্বরূপ একজন ভারতবাসীকে নির্জ্জন কারাকক্ষে রাখিবার আদেশ হইয়াছিল। দণ্ড পাইল, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু এই দণ্ডভোগের কোনও প্রয়োজনই ছিল না, আর একাজ করিতে দ্বিধা বোধ কথাও ঠিক নয়। যখন আমি একাজ করিতে প্রস্তুত হইলাম, তখন দারোগা অন্য সকলকেও একাজে আসিতে বলিল। পূর্ব্বোক্ত আদেশের কথা সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল, এবং কাজ অতি সামান্য হইলেও মিঃ উমর ওস্‌মান ও মিঃ রুস্তম আমার সাহায্যের জন্য ছুটিলেন। এ কথার উল্লেখ করিয়া শুধু ইহাই দেখাইতে চাই যে, গবর্ণমেণ্ট যে কাজ করাইতে চাহিয়াছিলেন ইঁহারা সে কাজ করিতে কোনই সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, গৌরবই বোধ করিয়াছিলেন। যে কাজ দেওয়া হয় তাহা করিতে অস্বীকার করিলে আমরা সত্যাগ্রহের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ি।

জোহান্সবর্গে বদলী।

এতক্ষণ বোক্‌সরষ্ট জেলের কথা বলিতেছিলাম, এখন তাহার পরের ঘটনা বলি। আমাকে দুই মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, সমস্ত সময়টাই বোক্‌সরষ্ট জেলে কাটাইতে হয় নাই। কিছুদিন পরে হঠাৎ আমাকে জোহান্সবার্গ জেলে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। ২৫শে অক্টোবর আমাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল, কারণ একটি মোকদ্দমায় আমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। আমার মনে হইতেছিল, ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে। আমাদের সকলেরই মনে মনে খুব আশা ছিল, সুতরাং ভাবিলাম,—হয়ত বা মিঃ স্মাট্‌স্‌এর সহিত কোনও একটা আলোচনা হইবে। কিন্তু পরে দেখিলাম, সে সব কিছুই নয়। আমাকে লইয়া যাইবার জন্যই জোহান্সবর্গ হইতে এক দারোগাকে বিশেষ করিয়া পাঠান হয়। আমার ও তাহার জন্য ট্রেণে একটি কামরা দেওয়া হইয়াছিল। সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট ছিল, কারণ সে ট্রেণে থার্ড ক্লাসের গাড়ীই ছিল না। আমি জানিতাম, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেই কয়েদী লইয়া যাওয়া হয়। ট্রেণেও আমার কয়েদীর পোষাক ছিল। আমার জিনিষপত্র আমাকেই বহিয়া নিতে হইল। জেলখানা হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল, জোহান্সবর্গে পৌছিলে সেখান হইতে জেল পর্য্যন্ত বোঝা বহিয়া যাইতে হইল। এই ঘটনায় কাগজে খুব আন্দোলন হয়। পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত প্রশ্ন উঠে। অনেকেই এ ঘটনায় ব্যথা পাইয়াছিলেন। সকলের মনে হইল, আমার মত রাজনৈতিক কয়েদীকে সাধারণ কয়েদীর পোষাকে লইয়া যাওয়া ও বোঝা বহান অন্যায়।

যখন মিঃ আঙ্গলিয়া শুনিলেন যে আমাকে এইভাবে যাইতে হইবে, তখন তাঁহার চোখে জল আসিল। এই ঘটনা হইতে তখন বুঝিলাম,

লোকের মনে কষ্ট হইয়াছে। মিঃ নায়ডু ও মিঃ পোলক সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা ষ্টেশনে আসিয়া জুটিলেন। আমার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের কান্না পাইল। এই সকল কান্নাকাটির কোনও কারণ ছিল না। এ দেশে রাজনৈতিক ও সাধারণ কয়েদীর মধ্যে প্রভেদ রাখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের যত বেশী কষ্ট দেওয়া হইবে এবং যত কষ্ট আমরা ভোগ করিব, তত শীঘ্রই মুক্তি আসিবে। আর আমার মনে হয়, জেলের পোষাক পরায় ও বোঝা বহায় কোনও কষ্টই নাই। কিন্তু জগৎ এমনই যে এ কথা বোঝে না। এই ঘটনায় ইংলণ্ডে বেশ আন্দোলন হইল।

পথে দারোগার জন্য কোনও কষ্টই হয় নাই। ঠিক করিয়াছিলাম, দারোগা নিজে যদি বিশেষ অনুমতি না দেন, তবে জেলে ছাড়া অন্য কোথাও কিছু খাইব না। জেলের খাবারের উপরেই এ পর্য্যন্ত নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। রাস্তার জন্য সঙ্গেও খাবার লওয়া হয় নাই। দারোগা স্বেচ্ছায় আমাকে খাওয়া দাওয়ার অনুমতি দিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার আমাকে কিছু পয়সা দিতে চাহিলেন; তাঁহার সহানুভূতির আতিশয্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু পয়সা লইতে সম্মত হইলাম না। মিঃ কাজীও ষ্টেশনে ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে ১০ শিলিং লইলাম। আমার এবং দারোগার জন্য তাঁহার নিকট হইতে খাবারও লইলাম।

সন্ধ্যার কাছাকাছি জোহান্সবর্গে পৌছিলাম। দারোগা আমাকে ভারতবাসীদের সহিত মিশিতে না দিয়া চুপে চুপে লইয়া গেলেন। জেলের যে কুঠুরীতে রুগ্ন কাফ্রি কয়েদীরা ছিল, সেখানে আমার বিছানা পাতা হইল। সে রাত্রি অত্যন্ত উদ্বেগে ও চিন্তায় কাটিল। আমাকে অন্য ভারতবাসীর কাছে লইয়া যাইবে, এ কথা আমার জানা ছিল না; আমার ধারণা ছিল, এই খানেই আমাকে রাখিবে। এই ভাবনায় আমি ব্যাকুল

হইয়া উঠিয়াছিলাম। তবু প্রাণপণে স্থির করিলাম, যাহা কিছু দুঃখ আসে তাহা সহ্য করিতেই হইবে। আমার কাছে ভগবদ্‌গীতা ছিল; পড়িলাম। সেই সময়ের উপযোগী শ্লোকগুলি পড়িয়া ও চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় শান্ত হইল। আমার ভয়ের কারণ,—পাছে লোকে আমাকে কাফ্রি বা চীনা, জংলী, খুনী, দুর্নীতিপরায়ণ কয়েদী বলিয়া মনে করে। তাহাদের কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। কাফ্রিরা আমার সহিত কথা আরম্ভ করিয়া দিল, তাহাদের কথার মধ্যে বিদ্রূপের আভাস দেখিলাম। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না, আমি কথার কোনও উত্তর দিলাম না। তাহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোকে এখানে কেন আনা হইয়াছে?" আমি যা' তা' একটা উত্তর দিয়া চুপ করিলাম। একজন চীনা তখন প্রশ্ন আরম্ভ করিল, তাহা আরও খারাপ লাগিল। বিছানার সামনে আসিয়া সে আমার পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া থাকিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম; তখন সে কাফ্রিদের বিছানার দিকে গেল; সেখানে দুইজন লোক অন্য একজনের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, এবং পরস্পরের দোষ দেখাইতেছে। মনে হইতেছিল, ইহারা দুইজন খুনী বা ডাকাত। দেখিয়া শুনিয়া আমার ঘুম উড়িয়া গেল। কাল সকল কথা গবর্ণরকে জানাইব স্থির করিলাম। অনেক রাত্রে তন্দ্রা আসিল।

ইহাই ত প্রকৃত কষ্ট; ইহার তুলনায় মোট বহা ত কিছুই নয়। আমার যে অভিজ্ঞতা হইল, অন্যান্য ভারতীয়দেরও ঐরূপ অভিজ্ঞতাই হইয়া থাকে; উহারাও এইরূপ ভয় পায়। এই কথা মনে করিয়া, আমিও ঐরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছি ইহা ভাবিয়া আমি খুশী হইলাম। আমি ভাবিলাম, এই অভিজ্ঞতা লইয়া আমি গবর্ণমেণ্টের সহিত আরও জোরে লড়িতে পারিব আর জেলে আসিয়া এই বিষয়ের সংস্কার করাইব। এসকল সত্যাগ্রহ সংগ্রামের গৌণ ফল। পরদিন শয্যাত্যাগ করিতেই আমাকে

অন্যান্য ভারতীয় কয়েদীর কাছে লইয়া যাওয়া হইল। সুতরাং গবর্ণরকে এ বিষয়ে বলার অবকাশ মিলিল না। তথাপি আমার মনে এই চিন্তা হইল যে, এইরূপে ভারতবাসী ও কাফ্রি কয়েদী যাহাতে একত্র রাখা না হয় সেজন্য আন্দোলন করিতে হইবে। আমার যাওয়ার সময় জন পনের কয়েদী সেখানে ছিল—তার মধ্যে তিন জন ছাড়া আর সকলেই সত্যাগ্রহী। সে তিনজন অন্য অপরাধে অভিযুক্ত, তাহারা কাফ্রিদের সঙ্গেই থাকিত। আমি গেলে পর বড় দারোগা আদেশ দিলেন যে আমাদের সকলের জন্য পৃথক কুঠুরী দেওয়া হউক। আক্ষেপের বিষয়, দেখিলাম অনেক ভারতীয় কয়েদী কাফ্রিদের সহিত শুইতে ভালই বাসিত, কারণ সেখানে প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া তামাকটা আসটা আসিতে পারিত। আমাদের পক্ষে এটা লজ্জার কথা, কাফ্রি বা অন্য কাহাকেও ত' ঘৃণা করি না, কিন্তু এ কথাও ভোলা যায় না যে তাহাদের ও আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন আহারের মধ্যে মিল নাই। আবার, যাহারা তাহাদের সহিত বাস করিতে চাহিত তাহারাও স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এরূপ করিত। এরূপ কোন ভাব আমাকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করিলে সে ভাব মন হইতে দূর করিয়া দেওয়াই উচিত।

জোহান্সবর্গের জেলে আর একটি বিষয় আমাকে কষ্ট দিয়াছিল। এখানে জেলের দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ ছিল। একটিতে থাকিত সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয় ও কাফ্রিরা, অন্যটীতে বিনাশ্রমে দণ্ডিত কয়েদী রাখা হইত। সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না। আমরা দ্বিতীয় বিভাগে শুইতাম, কিন্তু সেখানকার পায়খানা ইত্যাদি ব্যবহার করিবার অধিকার আমার ছিল না। প্রথম বিভাগে কয়েদীদের সংখ্যা এত বেশী যে, সেখানে পায়খানায় যাওয়া একটা কষ্টকর ব্যাপার। অনেক ভারতবাসীই এইজন্য খুব কষ্ট পাইতেন,

তাহার মধ্যে আমিও একজন। দারোগা বলিল, আমি দ্বিতীয় বিভাগের পায়খানায় গেলে কোন ক্ষতি নাই,—সুতরাং আমি তাহাই গেলাম। সেখানেও খুব ভিড়, পায়খানাও খোলা,—দরজা নাই। আমি বসিতেই এক লম্বা চওড়া, রুক্ষদর্শন, বিকটাকার কাফ্রি আসিয়া আমাকে উঠিতে বলিল ও গালি দিতে লাগিল; আমি বলিলাম, এখনই উঠিতেছি। কিন্তু ইহাতেও সে হাত ধরিয়া উঠাইল এবং বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে চৌকাট ধরিয়া ফেলায় মাটীতে পড়িয়া গেলাম না। আমি ইহাতে অস্থির হই নাই, হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু কয়েকজন ভারতবাসী আমার অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জেলে তাহারা ত' কোন সাহায্যই করিতে পারিত না, তবে নিজেদের নিরুপায় অবস্থা দেখিয়া রাগিয়া উঠিত অবশ্য। পরে বুঝিলাম, অন্য ভারতবাসীরও ত' এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে গবর্ণরের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইল, বলিলাম—ভারতবাসীদের জন্য আলাদা পায়খানা করিয়া দেওয়া দরকার; আর, কাফ্রি কয়েদিদের সঙ্গে ভারতবাসীদের যেন কখনও একত্র রাখা না হয়। গবর্ণর তখনই বড় জেলের ছয়টি পায়খানা ভারতীয় কয়েদীর জন্য আলাদা করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। তখন হইতে এ কষ্ট দূর হইল। চারদিন পায়খানা যাইতে না পাইয়া আমারও শরীর যথেষ্ট খারাপ হইয়াছিল।

জোহান্সবর্গে থাকিবার সময় আমাকে তিন চার বার আদালতে যাইতে হয়; সেখানে মিঃ পোলক ও আমার পুত্রের সহিত দেখা করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম; কখনও কখনও অন্য কাহারও সঙ্গে দেখা হইত। আদালত আমাকে বাড়ী হইতে খাবার আনিবার আদেশও দিয়াছিলেন, তাহাতে মিঃ কেলেনবেক আমার জন্য রুটী, পনীর প্রভৃতি আনিয়া দিতেন।

আমি এই জেলে থাকিবার সময় সত্যাগ্রহী কয়েদীর সংখ্যা খুব বাড়িয়া গেল। একবার ত' পঞ্চাশের উপর উঠিল। অনেককেই পাথরে বসিয়া ছোট একটি হাতুড়ি দিয়া পাথর ভাঙ্গিবার কাজ দেওয়া হইয়াছিল। ৮।১০ জনকে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিবার কাজ দেওয়া হইল। আমাকে কলে টুপি সেলাই করিতে দেওয়া হইয়াছিল। কলের কাজ এইখানেই আমি প্রথম শিখিলাম। কাজটা সহজই ছিল, শিখিতে দেরী হইল না। অধিকাংশ ভারতবাসীকেই পাথর ভাঙ্গার কাজে লাগান হইয়াছিল, সুতরাং আমিও এই কাজ করিতে চাহিলাম। কিন্তু দারোগা বলিল, "আমাকে বড় দারোগা নিষেধ করিয়া দিয়াছে যেন তোমাকে বাহিরে লইয়া না যাই।" সে আমাকে পাথর ভাঙ্গিতে যাইতে দিল না। একদিন আমার মেশিনে বা হাতে সেলাই করার কোনও কাজই ছিল না, তখন আমি পড়িতে লাগিলাম। নিয়ম আছে যে প্রত্যেক কয়েদীকেই জেলে কোন না কোন কাজ করিতে হইবে। দারোগা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি, তোমার আজ অসুখ করিয়াছে?" উত্তর দিলাম, "না, মহাশয়"; "তবে কাজ করিতেছ না কেন?" উত্তর দিলাম, "আমার যা' কাজ ছিল তা' শেষ হইয়া গেছে—আমি কাজের ছুতা করিতে চাহি না;—কাজ দাও, করিতে প্রস্তুত আছি, যখন কোনও কাজ নাই, তখন পড়িলে ক্ষতি কি?"

সে বলিল—"তা' ঠিক; তবে যখন বড় দারোগা বা গবর্ণর আসিবেন তখন তুমি ষ্টোরে থাকিলে ভাল হয়।"

না, আমি তাহাতে রাজী নই। আমি ত' গবর্ণরকেও বলিয়াছি ষ্টোরেও পুরা কাজ আমার থাকে না—আমাকে কাঁকড় ভাঙ্গিতে পাঠাইয়া দেওয়া হোক না।" "সে খুব ভালই হয়, কিন্তু আমি ত' আর বিনা হুকুমে তোমাকে কাঁকড় ভাঙ্গিতে পাঠাইতে পারি না।"

ইহার কিছুক্ষণ পরেই গভর্ণর আসিলেন, আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি কাঁকর ভাঙ্গিতে যাইবার আদেশ দিলেন না, বলিলেন, "তোমার সেখানে যাইবার কোনই দরকার নাই, কালই তোমাকে বোকসরষ্ট যাইতে হইবে।"

ডাক্তারী পরীক্ষা।

বোকসরষ্টের জেলটি ছোট, এই জন্য এখানে কতকগুলি সুবিধা মিলিত যাহা জোহান্সবর্গে পাওয়া যাইত না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, এখানে মিঃ দাউদ মহম্মদ প্রভৃতি কয়েকজনকে পায়জামা পরিতেও দেওয়া হইত, মিঃ রুস্তমজী, মিঃ সোরাবজী, মিঃ সাপ্রুকে নিজেদের টুপি পরিতে দেওয়া হইত। কিন্তু জোহান্সবর্গ জেলে আরও একটি অসুবিধা ছিল। সেখানে যখন কয়েদী প্রথম ভর্ত্তি হইত, তখন ডাক্তার পরীক্ষা করিতেন। উদ্দেশ্য, যদি কোনও কয়েদীর সংক্রামক রোগ থাকে, তবে তাহাকে ঔষধ দেওয়া ও পৃথক করিয়া রাখা হইবে। সুতরাং মাঝে মাঝে কয়েদীর পরীক্ষা হইত। অনেকেরই চুলকাণি ইত্যাদি ছিল। কয়েদীদের দেহ উলঙ্গ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করা হইত। ডাক্তারের সময় কম বলিয়া কাফ্রিদের ত' ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সকলকেই নগ্ন অবস্থায় দাঁড় করাইয়া রাখা হইত। ডাক্তার কাছে আসিলে ভারতবাসিদিগকে জাঙ্গিয়া খুলিতে হইত। প্রায় সকল ভারতবাসীই জাঙ্গিয়া খুলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন—অনেকে সত্যাগ্রহের অনুরোধে চুপ চাপ করিয়া থাকিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই কষ্ট পাইতেন। ডাক্তারকে এ বিষয়ে বলিলাম, তিনি কয়েকজনকে ষ্টোরের ভিতর লইয়া গিয়া পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা এরূপ করিতে

অস্বীকার করিলেন। এসোশিয়েশন্ এ বিষয়ে লেখালেখি করিয়াছিল, এবং ব্যাপারটা আজ পর্য্যন্ত (১৯০৮) বিচারাধীন রহিয়াছে। এ বিষয়ে একটা প্রতীকার করা উচিত। বহুদিন ধরিয়া যে রীতি চলিয়া আসিয়াছে তাহা হঠাৎ বদলানের দরকার নাই, তবু এ বিষয়ে বিচার করা উচিত। পুরুষদের পক্ষে না হয় খুব বেশী প্রয়োজন নাই হইল, তাই বলিয়া নিজকে এরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে দেওয়ার পক্ষেও খুব যুক্তি নাই। অবশ্য, মিথ্যা লজ্জার কারণ কিছু নাই। যদি মন পবিত্র থাকে, তবে এরূপ নগ্নতার মধ্যে লজ্জার কি আছে? জানি, আমার এই মত প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছেই বিচিত্র বলিয়া মনে হইবে। তথাপি, এ বিষয়ে গভীর চিন্তার প্রয়োজন। আর এ বিষয়ে আপত্তি করায় আমাদের সত্যাগ্রহধর্ম্মের ক্ষতি হইবে। আগে ত' ভারতীয় কয়েদীর মোটেই পরীক্ষা হইত না। একবার ২।৩ জন ভারতবাসী রোগ থাকা সত্ত্বেও বলিয়াছিল যে তাহাদের কোন রোগ নাই; ডাক্তারের সন্দেহ হওয়ায় ডাক্তার পরীক্ষা করেন, তখন রোগ ধরা পড়ে। সেই সময় হইতে ডাক্তার, ভারতবাসীদেরও পরীক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহাতেই বোঝা যায়, অধিকাংশ স্থলে আমরা নিজেরাই বিপদ ডাকিয়া আনি।

জোহান্সবর্গ হইতে প্রত্যাগমন।

৪ঠা নভেম্বর আমি আবার বোকসরষ্ট জেলে ফিরিয়া আসিলাম। এবারও আমার সঙ্গে একজন দারোগা ছিল, পোষাকও কয়েদীর মত ছিল। এবার আমাকে পায়ে না হাঁটাইয়া, গাড়ীতে করিয়া ষ্টেশনে আনা হইল, কিন্তু টিকিট ছিল তৃতীয় শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর নয়। পথে খাইবার জন্য

আমাকে আধ পাউণ্ড (প্রায় এক পোয়া) রুটী ও গো-মাংস দেওয়া হইল। আমি গো-মাংস লইতে অস্বীকার করিলাম। তখন দারোগা আমাকে পথে অন্য জিনিষ খাইবার অনুমতি দিল। ষ্টেশনে অনেক ভারতীয় দরজি দেখিলাম। তাহারাও আমাকে দেখিল, কিন্তু কথা বলা মানা ছিল। আমার পোষাক দেখিয়া তাহাদের চোখে জল আসিল। পোষাক সম্বন্ধে ভাল মন্দ বলার অধিকার ত' আমার ছিল না, আমি তাই চুপ করিয়াছিলাম আমি ও দারোগা একটি আলাদা কামরায় উঠিলাম। পাশের গাড়ীতে একজন দরজি ছিল, সে নিজের খাবার হইতে আমাকে কিছু দিল। হেডেলবার্গে মিঃ শোভাভাই পেটেল আসিলেন, ষ্টেশন হইতে তিনি কিছু খাবার আনিয়া দিলেন। যাঁহার নিকট হইতে তিনি খাবার আনিলেন তিনি সত্যাগ্রহের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ মূল্য নিতে চাহিলেন না, মিঃ শোভাভাই বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে মূল্য স্বরূপ নাম মাত্র ছয় পেনী লইলেন। মিঃ শোভাভাই ষ্টাণ্ডারটনে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাই অনেক ভারতবাসীই ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সঙ্গে খাবার আনিয়াছিলেন, সুতরাং পথে দারোগার ও আমার খাওয়াটা বেশ ভালই হইয়াছিল।

বোকসরষ্টে পৌছাইতেই মিঃ নগদী ও মিঃ কাজী আসিলেন। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কিছু দূর গেলেন। একটু তফাতে তফাতে চলিবেন, এই অনুমতি তাঁহারা পাইয়াছিলেন। ষ্টেসন হইতে আবার আমাকে জিনিষ পত্র বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়। বোকসরষ্টে আমাকে আবার আসিতে দেখিয়া ভারতবাসীরা সকলেই খুব সুখী হইলেন। সেই রাত্রে আমাকে মিঃ দাউদ মহম্মদের কুঠুরীতে বন্ধ করা হয়। আমরা দুজনে নিজেদের কথা বলিয়া অনেক রাত্রি কাটাইলাম।

বোকসরষ্টে যখন ফিরিয়া গেলাম, তখন দেখি, ভারতীয় কয়েদীদের চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ৩০ জনের স্থানে ৭৫ জন হইয়াছে। এই জেলে এতগুলি কয়েদীর স্থান ছিল না, তাই আটটি বাসা তৈয়ারী করা হইয়াছিল। রাঁধিবার জন্য প্রিটোরিয়া হইতে উনন আসিল। জেলের পাশে নদী ছিল, কয়েদীরা সেখানে স্নান করিতে পারিতেন; তখন তাঁহারা কয়েদী বলিয়া মনে হইত না, মনে হইত যেন সিপাহীরাই স্নান করিতেছে, সেটা যেন জেলখানা নয়, সত্যাগ্রহ আশ্রম। দারোগা কষ্ট দিতেছে কি সুখ দিতেছে তাহা ভাবার সময়ই জুটিত না। বাস্তবিক পক্ষে, অধিকাংশ দারোগাই মোটের উপর সজ্জন ছিল। মিঃ দাউদ মহম্মদ সকল দারোগারই একটা না একটা নাম রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও ডাকিতেন "উকলী", কাহাকে বা "মকুটী"। এইরূপ প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ নাম ছিল।

দেখা সাক্ষাৎ।

বোকসরষ্ট জেলে দেখা করিবার জন্য ভারতবাসী অনেকেই আসিতেন। মিঃ কাজী ত প্রায়ই আসিতেন এবং কয়েদীরা কিসে আনন্দে থাকে তাহার ব্যবস্থা তিনি খুবই করিতেন। অন্য যাহারা দেখা করিতে আসিত তাহাদের যাহাতে দেখাশোনার সুযোগ হয় সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। মিঃ পোলক কার্য্যোপলক্ষে প্রতি সপ্তাহেই দেখা করিতে আসিতেন। নেটাল হইতে মিঃ মহম্মদ ইব্রাহিম ও মিঃ খরসানী কংগ্রেসের প্রধান শাখার চাঁদা আদায়ের জন্য বিশেষ ভাবে আসিয়াছিলেন। ইদের

দিন ত' প্রায় শতাবধি ভারতবাসী তাঁহাদের নেটালের বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, সেদিন টেলিগ্রাফের সংখ্যা দেখে কে ?

বিবিধ।

জেলে সাধারণতঃ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা যায়; এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে রোগ সহজেই সংক্রামক হইয়া উঠিতে পারিত। তথাপি অনেক বিষয়ে অপরিচ্ছন্ন ভাব দেখা যাইত। গায়ে দিবার কম্বল প্রায়ই অদল বদল হইত, এমন কি, কাফ্রিদের গায়ে দেওয়া খুব ময়লা কম্বলও মাঝে মাঝে ভারতবাসিদের ভাগ্যে জুটিত। সেগুলি প্রায়ই থাকিত উকুণে ভরা, দুর্গন্ধও বাহির হইত খুব। রৌদ্র উঠিলে সেগুলি প্রায়ই আধঘণ্টা ধরিয়া রৌদ্রে রাখিতে হইবে, ইহাই ছিল নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কখনও পালন করা হইত কি না সন্দেহ। যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে, তাহাদের পক্ষে এই গোলমাল নিতান্ত সামান্য কথা নয়। পরণের কাপড়েরও অনেক সময় এইরূপ দশা হইত। কয়েদীদের মুক্তির সময় তাহাদের পরিত্যক্ত কাপড় প্রায়ই ধোওয়া হইত না, সেই ময়লা কাপড়ই নূতন কয়েদীকে দেওয়া হইত। ইহা বড় ঘৃণার কথা।

জেলে কয়েদীদিগকে যেমন তেমন ভাবে রাখা হইত। জোহান্সবর্গে স্থান ছিল দুই শত কয়েদীর, কিন্তু ঠাসা হইয়াছিল চারিশত। প্রত্যেক কুঠুরীতে যত লোক রাখার নিয়ম, তাহার দ্বিগুণ কয়েদী প্রায়ই রাখা হইত, সময় সময় তাহারা প্রয়োজনমত কম্বলও পাইত না। এ কষ্ট নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু প্রকৃতির বিধান এমনই যে নির্দোষ ব্যক্তি যে অবস্থায়ই পড়ুক না, আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার থাকিয়া যায়। ভারতীয় কয়েদীদের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল। এমন বিপদেও তাঁহারা

প্রসন্ন থাকিতেন, আর মিঃ দাউদ মহম্মদের মুখে ত চব্বিশ প্রহর হাসি লাগিয়াই আছে। শুধু তাহাই নয়, তিনি হাসি ঠাট্টা করিয়া অন্য সকল ভারতবাসীকেও হাসাইতেন।

দুঃখ করিবার মত একটি ঘটনা জেলে ঘটিয়াছিল। একদিন কয়েকজন ভারতবাসী একস্থানে বসিয়াছিলেন, এমন সময় জনৈক কাফ্রি দারোগা আসিয়া ঘাস কাটিবার জন্য দুই জন লোক চাহিল। কতকক্ষণ কেহই উত্তর দিল না, তখন মিঃ ইমাম আবদুল কাদির যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তখনও তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য কেহ উঠিল না। সকলেই দারোগাকে বলিতে আরম্ভ করিল, ইনি আমাদের ইমাম সাহেব, ইঁহাকে লইয়া যাইও না। একথা বলায় ব্যাপারটা আরও খারাপ হইল। একে ত সকলেরই ঘাস কাটিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল, সে কথা যাক্। যখন স্বজাতির নাম রাখিবার জন্য ইমাম সাহেব দাঁড়াইলেন, তখন ইহারা তাঁহার পদ প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিল! তিনি ঘাস কাটিবার জন্য তৈয়ারী, আর কেহ নয়, ইহা দেখাইয়া তাহারা নিজেদের নির্লজ্জতারই পরিচয় দিল।

ধর্ম্ম সঙ্কট।

আমার অর্দ্ধেক দণ্ডভোগ শেষ হইয়াছে এমন সময়ে ফিনিক্স হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে, মিসেস্ গান্ধীর শরীর অসুস্থ। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এজন্য আমার যাওয়া উচিত। সকলেই এ সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। আমি দ্বিধার মধ্যে পড়িলাম, ভাবিলাম—এখন আমার কর্ত্তব্য কি? জেলার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জরিমানা দিয়া, যাইতে চাও?" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "জরিমানা ত আমি কোনও অবস্থায়ই দিতে পারি না, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ সহ্য করাও আমার সত্যাগ্রহ সংগ্রামের

একটি অঙ্গ।" এ কথা শুনিয়া জেলর হাসিল, একটু বিরক্তও হইল। সাধারণ ভাবে দেখিলে আমার এ সিদ্ধান্ত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস,—ইহাই সত্য ও শ্রেয়স্কর। স্বদেশপ্রেমকে আমি আমার ধর্ম্মের একটি অঙ্গ মনে করি। তাহাতে শুধু ইহাই বোঝায় না, যে, স্বদেশপ্রেমেই ধর্ম্মের সকল অংশের সমাবেশ আছে; কিন্তু একথাও বুঝিতে হইবে যে, স্বদেশপ্রেম ব্যতীত ধর্ম্ম পূর্ণ হইতে পারে না। ধর্ম্ম পালনের জন্য যদি স্ত্রীপুত্র বিয়োগ সহ্য করিতে হয়, তবে তাহাও সহা উচিত। তাহাদের সঙ্গ যদি চিরকালের জন্য হারাইতে হয়, তাহা হইলেও এই পথে চলিতে হইবে; ইহাতে লেশমাত্র নিষ্ঠুরতা নাই। ইহা ত' স্বদেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্যই। যখন আমাকে আমরণ সংগ্রাম করিতে হইবে, তখন ইহা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। যেদিন তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ আসিল, সেদিন তাঁহার করণীয় শেষ হইয়া আসিলেও লর্ড রবার্ট্‌স্ কাজ করিতেছিলেন, এবং একমাত্র পুত্রের দেহ সমাধিস্থ করিবার সময়ও যোগ দিতে পারেন নাই, কারণ তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এরূপ উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল নহে।

কাফ্রিদের ঝগড়া।

জেলে অনেকগুলি খুনী কাফ্রি ছিল। তাহারা প্রায়ই লড়াই-ঝগড়া করিত, এমন কি, কুঠুরীতে বন্ধ করিয়া দিলেও ক্ষান্ত হইত না। কখনও কখনও ত' দারোগাকেও অপমান করিত। কয়েদীরা দারোগাকে দুইবার মারিয়াও ছিল। এরূপ কয়েদীর সঙ্গে ভারতবাসীদের একত্র রাখিলে কি কুফল হয় তাহা ত' স্পষ্টই বুঝা যায়। সৌভাগ্যের বিষয়,

ভারতবাসীদের এরূপ নীচতা এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু যতদিন গভর্ণমেণ্টের আইনে কাফ্রিদের সহিত ভারতবাসীকে একসঙ্গে গণনা করিবার ব্যবস্থা, ততদিন এই অবস্থায় বিপদের সম্ভাবনা আছে।

জেলে স্বাস্থ্য।

জেলে অধিকাংশ কয়েদীরই বিশেষ কোন রোগ ছিল না। মিঃ মাওজীর কথা প্রথমে বলিয়াছি। মিঃ রাজু নামে একজন তামিল (মান্দ্রাজী) আমাদের মধ্যে ছিলেন। একবার তাঁহার খুব রক্তামাশয় হয়—তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাহার কারণ তাঁহার মুখে শোনা গেল, প্রত্যহ ৩০ কাপ্ (পেয়ালা) চা পান করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। জেলে আর চা কোথায়, তাই তাঁহার অসুখ বাড়িয়া উঠিল। চা পাওয়ার চেষ্টাও তিনি করিলেন, কিন্তু পাওয়া গেল না। তাহার বদলে ঔষধ পাওয়া গেল, এবং জেলের ডাক্তার তাঁহাকে ২ পাউণ্ড দুধ ও রুটি দিবার হুকুম দিলেন। ইহাতে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। মিঃ রাধাকৃষ্ণ তালেবন্ত সিংহের শরীর শেষ পর্য্যন্ত খারাপই রহিল। মিঃ কাজী ও মিঃ বাওজীব্ শেষ পর্য্যন্ত রোগে ভুগিলেন। মিঃ রতনশী সোঢ়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিতেছিলেন ও একাহারী ছিলেন, ভাল খাবার না পাওয়ায় তিনি ক্ষুধিতই থাকিতেন। কিন্তু তিনিও শেষাশেষি ভাল হইয়া উঠিলেন। তাহা ছাড়া প্রত্যেককেই অল্প বিস্তর রোগে ভুগিতে হইয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম, ভারতবাসীরা কেহই রোগে আতুর হন নাই। দেশের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা সকল কষ্টই সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

বাধাবিপত্তি

দেখা গেল যে বাহিরের বিপদ অপেক্ষা ভিতরের বাধাগুলি বেশী কষ্ট দিতেছিল। মাঝে মাঝে সেখানেও হিন্দু মুসলমান, উচ্চ-নীচ জাতি ভেদের ভাব ফুটিয়া উঠিত। সেখানে সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর ভারতবাসী ছিলেন। তাঁহাদের ব্যবহারেই বোঝা যাইত, আমরা স্বরাজ লাভের পথে কতখানি পিছনে পড়িয়া আছি; তবে এ কথাও দেখা গেল যে ইহাতে এমন কিছু নাই যাহাতে স্বরাজ সাধন অসম্ভব করিয়া তোলে; যাহা কিছু বাধা ঘটিতেছিল তাহা শেষাশেষি দূর হইয়া গেল।

অনেক হিন্দু বলিতেন, তাঁহারা মুসলমানের বা অন্য হিন্দুর হাতে খাইবেন না; এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের ভারতবর্ষের বাহিরে যাওয়াই উচিত নয়। শ্বেতাঙ্গ বা কাফ্রি, যে কেহই খাবার স্পর্শ করুক না, তাহাতে ক্ষতি কি? একবার ত' একজন বলিয়া বসিলেন, আমি চামারের কাছে শুইব না। এটাও আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। খোঁজ করার পরে জানা গেল, তাঁহার জাতিভেদ ভাব বিশেষ ছিল না, দেশে তাঁহার স্বজাতিরা শুনিয়া আপত্তি করিবে, এই ভাবিয়া শুধু তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। আমি জানি, এই ভাবে উচ্চ নীচ ভেদে ও স্বজাতির অত্যাচারে আমরা সত্য ভুলিয়া অসত্যের আদর করিতেছি। যদি এ বোধ জাগিয়া ওঠে যে, চামারকে তিরস্কার করিবার কিছুই নাই, তখন—স্বজাতির বা অন্য কাহারও অন্যায় অত্যাচারের ভয়ে সত্যকে ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া নিজকে সত্যাগ্রহী বলিয়া পরিচয় দিতে পারি? আমার ইচ্ছা হয়, যাঁহারা এই সংগ্রামে যোগদান করিবেন তাঁহারা জাতি, পরিবার ও স্বধর্মের বিরোধ ঘুচাইয়া তবে যেন সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এরূপ করি না বলিয়াই আমাদের আন্দোলন শিথিল হয়। এ কথা আমার সত্য বলিয়া

মনে হয়। যখন আমরা সকলেই ভারতবাসী, তখন এক দিকে মিথ্যা ভেদ রাখিয়া, অন্য দিকে বড় বড় কথা বলিয়া অধিকার চাওয়া কেমন করিয়া সম্ভব? কিম্বা 'দেশে লোকে কি বলিবে,' এই ভয়ে সত্যকে যদি ত্যাগ করি, তবে কেমন করিয়া এই বিরোধে জয়ী হইব? ভয়ে কোনও পথ ত্যাগ করা ভীরুর কাজ। কোনও ভীরু ভারতবাসীই সরকারের বিরুদ্ধে এই মহাসংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিবে না

জেলে কাহারা যাইতে পারে? এতেই বোঝা যাইতেছে, ব্যসনগ্রস্ত, মিথ্যা জাতি-ভেদ আচারী, কলহপ্রিয়, অথবা যাহারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 'উচ্চ' 'নীচ' এই ভেদ দেখে, কিম্বা যাহারা রুগ্ন, এমন কেহ জেলে যাইতেই পারিবেন না, গেলেও বেশী দিন সেখানে টিকিতে পারিবেন না। দেশহিতের নামে সম্মান বোধে যাঁহারা জেলে যাইবেন, তাঁহাদের দেহ, মন, আত্মা, সুস্থ ও সবল হওয়া দরকার। যে ব্যক্তি রুগ্ন, সে পরিণামে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে উচ্চ নীচ বোধ যাহাদের আছে, যাহারা ব্যসনগ্রস্ত, কলহপ্রিয়, একটুকু চা, বিড়ি কিম্বা অন্য কোনও দ্রব্যের বিনিময়ে যাহারা নিজেকে বিকাইয়া দিতে পারে, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত সেখানে থাকিতে পারে না।

পড়াশুনা।

সারাদিন কাজ করিলেও, সকালে, সন্ধ্যায় ও রবিবারে পড়িবার কিছু সময় পাওয়া যায়। জেলে অন্য কোনও ঝঞ্ঝাট না থাকায় পড়াও বেশ ভাল হয়। খুব অল্প সময় পাওয়া স্বত্বেও রাস্কিনের দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ, থোরোর প্রবন্ধাবলী, বাইবেলের কিছু অংশ, গুজরাতী ভাষায় গারিবল্‌ডীর জীবন চরিত ও বেকনের প্রবন্ধাবলী, এবং আরও দুই খানি ইংরেজী পুস্তক

(ভারতবর্ষের বিষয়ে) আমি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম। রাস্কিন ও থোরোর প্রবন্ধাবলী স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহের কথায় পূর্ণ। মিঃ দেওয়ান্ আমাদের জন্য গুজরাতী পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ছাড়া প্রায় সদা সর্ব্বদা ভগবদ্গীতা পাঠ হইত। ইহার ফলে, সত্যাগ্রহ আমার হৃদয়ে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, এবং বলিতে পারি যে জেলে এমন কিছু ছিল না যাহাতে আমার হৃদয়ে কোনও অস্থির ভাব আনিয়া দিতে পারিত।

উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে দুই ভিন্ন ভাব মনে জাগিতে পারে :—

প্রথমতঃ, মনে হইতে পারে, এই রকম জেলে বদ্ধ হওয়া, মোটা খদ্দর ও খারাপ কাপড় পরা, খারাপ খাদ্য খাওয়া, ক্ষুধায় মরা, দারোগার গালি খাওয়া, কাফ্রিদের সঙ্গে থাকা, পছন্দ হউক আর নাই হউক সকল কাজ করা ; দারোগা হয়ত আমার চাকর হইতে পারিত, তাহার আদেশ সর্ব্বদা মানা, নিজের প্রিয় আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে না পারা, কাহাকেও চিঠি লিখিতে না পারা, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র না পাওয়া, খুনী এবং ডাকাতের সঙ্গে একত্র বাস করা,—এ সকল দুঃখ ভোগ কেন করিব ? এর চেয়ে ত মৃত্যুও ভাল। জরিমানা দিয়া মুক্তি পাওয়া বরং ভাল, তবু জেলে যাওয়া ভাল নয়। ভগবান্ করুন, কাহারও যেন জেলে যাইতে না হয়।

কিন্তু এই রকম চিন্তা মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে সে জেলকে ভয় পায়, এবং যে কল্যাণ সাধনের জন্য সে জেলে যায় তাহা অপূর্ণ থাকে।

আর এক ভাব মনে জাগিতে পারে :—

দেশহিতের জন্য, মানরক্ষার জন্য, ধর্ম্মের জন্য যদি আমার জেলে যাইতে হয় ত' সে আমার সৌভাগ্য। জেলে দুঃখ কিসের ? বাহিরে এখানে ত আমাকে অনেকের তাঁবেদারী করিতে হয়, জেলে শুধু দারোগার আদেশই মানিয়া চলিতে হয়। জেলে ত কিছুরই চিন্তা করিতে হয় না,—না

উপার্জ্জনের, না খাওয়া দাওয়ার। সেখানে অন্যে ঠিক সময়ে রাঁধিয়া দেয়; স্বয়ং সরকার বাহাদুর সেখানে শরীররক্ষী। আর তার জন্য ত আমাকে কিছুই দিতে হয় না। এমন কর্ম্মও জুটিতে পারে যে তাহাতে ব্যায়ামের কাজ বেশ হইয়া যায়। সকল ব্যসন সহজেই দূর হইয়া যায়, মন স্বাধীন থাকে, ঈশ্বরের আরাধনার সুযোগ আপনিই আসে। সেখানে ত' শুধু শরীর বন্দী হইয়া থাকে, আত্মা পূর্ণতর স্বাধীনতা লাভ করে। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে শয্যা ত্যাগ করিতাম। শরীরকে যে বন্দী করিয়াছে, শরীর রক্ষার ভার তাহারই উপর। নানারূপে স্বচ্ছন্দভাবেই দিন কাটে। যখন বিপদ আসিল বা দুষ্ট দারোগা যখন আমার প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তখন ধৈর্য্য ধারণের অভ্যাস আমার হয়। তাহার বিরুদ্ধাচরণ আমার কর্ত্তব্য; তাহাতেই আমার আনন্দ। এই ভাবে দেখিলে জেল পবিত্র ও সুখদায়ক মনে করা ও মত সেই ভাবে গড়িয়া তোলা নিজের হাতে। মনের অবস্থা বিচিত্র; অল্পেই সে ব্যথা পায়, অল্পেই তাহার আনন্দ। আমার আশা, আমার কারাবাসের এই দ্বিতীয় কাহিনী পড়িয়া পাঠক দেশ বা ধর্ম্মের জন্য জেলে যাওয়া, সেখানে দুঃখ ভোগ করা ও অন্যান্য বিপদ মাথা পাতিয়া লওয়া আপনার কর্ত্তব্য মনে করিবেন। এই কথা মনে করিয়াই আমি আনন্দ পাই।

তৃতীয় বার

বোকসরষ্ট।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী আমার প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইলে আমি যখন বোক্‌সরষ্টের জেলে বন্দী ভ্রাতৃবৃন্দ ও পুত্রের সহিত মিলিত হইলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, এই তৃতীয় বারের জেল সম্বন্ধে কিছু বলার বা লেখার আর প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু মানুষের অন্য অনেক ধারণার মতই আমার এ ধারণাও মিথ্যা হইল। এইবার আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহা অন্য দুইবারের অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবার-কার শিক্ষা আমি বৎসরব্যাপী পরিশ্রমে ও অভ্যাসেও পাইতে পারিতাম না। জীবনের এই কয়টা মাসকে আমি অমূল্য মনে করি। এই অল্প দিনেই সত্যাগ্রহের কত ছবি আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ২৫শে ফেব্রুয়ারীর আগের তুলনায় কতখানি বেশী শক্তি আমি লাভ করিয়াছি! এই জন্য ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্টের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। গভর্ণমেণ্টের পক্ষীয় অনেকেও মনে স্থির করিয়াছিলেন, এবার আমার ছয়মাস জেল নিশ্চয়ই হইবে। আমার সঙ্গী, প্রবীণ, প্রসিদ্ধ ভারতবাসীগণ, আমার পুত্র—সকলেই ছয় মাসের জন্য দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিলাম, ভগবান্ করুন, লোকের আশা যেন পূর্ণ হয়।

কিন্তু আমার বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ ছিল না, সুতরাং ভয় হইতেছিল, বুঝি বা তিন মাস মাত্র দণ্ড হয়। হইলও তাহাই।

দণ্ডাদেশ হইবার পর, মিঃ দাউদ মহম্মদ, মিঃ রুস্তমজী, মিঃ সোরাবজী, মিঃ পিল্লে, মিঃ হজুরা সিংহ, মিঃ লালবাহাদুর সিংহ প্রভৃতি সত্যাগ্রহীদের সহিত আনন্দে মিলিত হইলাম। জন দশেক ছাড়া আর সকল কয়েদীর

শুইবার ব্যবস্থা জেলের মাঠের মধ্যে ঘরে হইয়াছিল। সুতরাং সে স্থান দেখিতে জেলের চেয়ে বরং লড়াই এর ছাউনীর মত লাগিত। সকলেই সেখানে শুইতে পাইয়া খুসী;—খাওয়ারও খুব সুবিধা। এবারও আগের মত আমাদের উপরেই রাঁধিবার ভার, সুতরাং নিজের রুচি অনুযায়ী খাবার পাওয়া যাইত। সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭ জন সত্যাগ্রহী কয়েদী ছিলাম। যাহাকেই যে কাজ দেওয়া হইত, প্রায়ই তাহা সহজ হইত। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীর সম্মুখে পাকা রাস্তা তৈয়ারী করিতে হইবে, তাহার জন্য পাথর, কাঁকর ইত্যাদি খুঁড়িতে ও গাদা করিতে হইত; মাদ্রাসার সামনের ময়দানে ঘাস কাটিতে হইত। সকলেই কিন্তু খুব মনের আনন্দে কাজ করিতেন।

তিন দিন পর্য্যন্ত আমি স্পেনটোলীর জমাদারের সঙ্গে কাজ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারই মধ্যে টেলিগ্রাম আসিল, আমাকে যেন বাহিরের কাজ করিতে না দেওয়া হয়। মনটা দমিয়া গেল, কারণ বাহিরে যাইতে বেশ আনন্দ লাগিত, শরীর ও স্বাস্থ্য দুইই ভাল বোধ হইত। সাধারণতঃ আমি দুইবার খাই, কিন্তু বোক্‌সরষ্ট জেলে কাজ করার জন্য দুইবারের বদলে তিনবার খাওয়ার দরকার হইত। এখন ঝাঁট দেওয়ার কাজ পাওয়া গেল; এই কাজে দিন কষ্টে কাটিত। কিন্তু এ কাজও শেষ হওয়ার সময় আসিল।

বোক্‌সরষ্ট হইতে নিষ্কৃতি।

২রা মার্চ্চ খবর আসিল, আমায় প্রিটোরিয়ায় পাঠাইবার হুকুম আসিয়াছে। সেই দিনই আমায় প্রস্তুত হইতে হইল। বৃষ্টি পড়িতেছিল—রাস্তাঘাট খারাপ ছিল;—এই অবস্থাতেও আমাকে গাঁঠ্‌রী উঠাইয়া

চলিতে হইল। সঙ্গে ছিল দারোগা; সন্ধ্যার ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে তাহার সঙ্গে চলিলাম।

অনেকেই এই ঘটনায় মনে করিল, ব্যাপার বুঝি মিটিবার উপক্রম হইতেছে; কেহ কেহ আবার মনে করিল, আমায় অন্যত্র লইয়া বেশী কষ্ট দেওয়ার ব্যবস্থাই হইবে; অনেকে ভাবিল,—সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, এ বিষয়ে জন সাধারণের মধ্যে যাহাতে বিশেষ কোনও সভা সমিতি বা আন্দোলন না হয়, এই জন্যই আমাকে প্রিটোরিয়ায় রাখিয়া বেশী কষ্ট দেওয়ার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে।

বোক্‌সরষ্ট ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না; সেখানে সারাদিন যেমন আনন্দে কাটাইতাম, রাত্রিতেও কথাবার্ত্তা বলিয়া, গল্প করিয়া, তেমনি আনন্দ পাইতাম। মিঃ হজুরা সিংহ ও মিঃ জোশী, এরা দুজনেই বেশ আসর জমাইতেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও নিরর্থক ছিল না, জ্ঞানধ্যানের কথায় তাঁহাদের মন সর্ব্বদা ভরপুর। যেখানে দিন রাত্রি এমন আনন্দে কাটিত, যেখানে এতগুলি ভারতবাসী একত্রে থাকিতেন, সে জায়গা ছাড়িতে কোন্ সত্যাগ্রহীর হৃদয়ই না ব্যথা পায়? কিন্তু মানুষের ইচ্ছামত কাজ হইলে ত কথাই ছিল না।

চলিলাম; পথে মিঃ কাজীর সঙ্গে সাদরসম্ভাষণ শেষ করিয়া দারোগা ও আমি গাড়ীতে উঠিলাম। শীত পড়িতেছিল; সারারাত্রি বৃষ্টি হইল। আমি গায়ে চাদর জড়াইবার অনুমতি পাইলাম। তাহাতে কিছু আরাম বোধ হইল, শীত একটু কমিল। সঙ্গে ছিল রুটী ও পনির; আমিত' খাওয়া সারিয়া বাহির হইয়াছিলাম, সুতরাং সেগুলি দারোগার কাজে লাগিল।

প্রিটোরিয়ায়।

৩রা প্রিটোরিয়ায় পৌছিলাম। সেখানে সকলই নূতন মনে হইল। জেল ও নূতন তৈরী, লোক ও সব নূতন। আমাকে খাইতে বলা হইল, কিন্তু ইচ্ছাই ছিল না। "মীলি মিলের" পরিজ্ দেওয়া হইল, এক চামচ খাইয়া রাখিয়া দিলাম। দারোগা অবাক্; বলিলাম, ক্ষুধা নাই; সে হাসিল। তাহার পর আমাকে অন্য এক দারোগার জিম্মায় রাখা হইল। সে বলিল, গান্ধী, টুপি নামাও। আমি টুপি নামাইলাম। তখন জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি গান্ধীর ছেলে? উত্তর দিলাম, না—আমার ছেলে বোক্সরষ্টে ছয় মাসের জেল খাটিতেছে। তখন আমাকে একটি কুঠুরীতে বন্ধ করা হইল, সেখানে পাইচারী করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দারোগা দরজার ছিদ্র দিয়া আমায় পাইচারী করিতে দেখিয়া বলিল, "গান্ধী, বেড়াস্ না—এক জায়গায় বোস্, মেঝে খারাপ হইতেছে।" পাইচারী বন্ধ করিয়া দিলাম; এক পাশে দাঁড়াইলাম। সঙ্গে পড়িবার কিছু ছিল না। আমার পুস্তক গুলি আমাকে দেওয়া হয় নাই। আন্দাজ ৮ টার সময় আমাকে বন্ধ করা হয়—১০টার সময় ডাক্তারের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোন ও সংক্রামক রোগ আছে? 'না' বলায় ফিরিয়া আসিলাম। আবার কুঠুরীতে বন্ধ করা হইল। ১১ টার সময় আমাকে অন্য একটি ছোট কুঠুরীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে অনেক ক্ষণ থাকিলাম। এই কুঠুরী গুলি এক এক জনের জন্য তৈয়ারী,—১০ ফিট লম্বা ৭ ফিট চওড়া, মেঝের আলকাতরা দেওয়া। মেঝে চক্চকে রাখার জন্য দারোগার অনুক্ষণ চেষ্টা। আলো বাতাসের জন্য কাচ ও লোহার গরাদ দেওয়া অনেকগুলি ছোট ছোট জানালা আছে। রাত্রে কয়েদীকে দেখিবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক

আলো ছিল,—কয়েদীর সুবিধার জন্য নয়, কারণ তাহাতে পড়িবার মত আলো হয় না, আলোর সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া বড় অক্ষরের বই পড়া চলিত। ঠিক আটটার সময়ে আলো নিভাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু রাত্রে ৫।৬ বার জ্বালা হইত, দারোগা দরজার ফাঁক দিয়া চট্ করিয়া কয়েদীকে দেখিয়া নিবে বলিয়া।

১১টা বাজিলে ডিপুটী গবর্ণর আসিলেন, তাঁহাকে আমি তিনটী কথা জানাইলাম। প্রথমতঃ, পুস্তকগুলি চাহিলাম; দ্বিতীয়তঃ, আমার স্ত্রীর অসুখের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিবার অনুমতি, ও তৃতীয়তঃ, বসিবার জন্য একটী বেঞ্চ। প্রথমটীর উত্তর—'বিচার করিয়া দেখা যাইবে। দ্বিতীয়টীর উত্তর—'চিঠি লিখিতে পার'; তৃতীয়টীর উত্তর 'না' পাওয়া গেল। গুজরাতীতে চিঠি লিখিলাম, তাহার উপর মন্তব্য হইল,—আইনতঃ ইংরেজীতে চিঠি লিখিতে হইবে। বলিলাম, আমার স্ত্রী ইংরেজী জানেন না, আর আমার চিঠি তাঁহার অসুখে ঔষধের কাজ করিবে। বিশেষ কিছু নূতন কথা লিখিবার ছিল না, তথাপি অনুমতি পাইলাম না। ইংরেজীতে লিখিবার আজ্ঞা আমি প্রত্যাখান করিলাম। সেইদিন সন্ধ্যায় আমার পুস্তকগুলি পাইলাম।

দ্বিপ্রহরে খাবার আসিল। কুঠুরীর মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই খাইতে হইল। তিনটার সময় আমি স্নান করিবার অনুমতি চাহিলাম। স্নানের জায়গা আমার কুঠুরী হইতে প্রায় ৪০ গজ দূরে। দারোগা বলিল,—"বেশ, কিন্তু কাপড় খুলিয়া উলঙ্গ হইয়া যাইতে হইবে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কি প্রয়োজন? আমি কাপড় পরদার উপর রাখিয়া দিব। তখন সে অনুমতি দিয়া বলিল, যেন বেশী দেরী না করি। শরীর মোছা শেষ হয় নাই, এমন সময়ে প্রভু হাঁক দিলেন,—'হয়েছে'? উত্তর দিলাম, হইতেছে।

কোন ভারতবাসীর মুখদর্শন ত' সেখানে ভাগ্যের কথা। সন্ধ্যার সময় কম্বল, চাদর ও পাতিবার জন্য মাদুর পাওয়া গেল—চৌকি টৌকি ছিল না। পায়খানায় পর্য্যন্ত দারোগা সঙ্গে যাইত। সে ত' আমায় জানিত না, তাই বলিত, 'হয়েছে, এইবার বাহিরে এস' কিন্তু আমার যে বেশীক্ষণ বসিবার অভ্যাস, সেটা সে বুঝিত না। এখন উঠি কেমন করিয়া? উঠিলে কাজ শেষ হয় না। মাঝে মাঝে আবার দারোগা বা একজন কাফ্রি দাঁড়াইয়া 'ওঠ্' 'ওঠ্' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিত।

দ্বিতীয় দিন কাজ পাওয়া গেল, তাহাও আবার মেঝে ও দরজা পরিষ্কার করিবার। দরজার উপর রং দেওয়া ছিল,—দরজা কিন্তু লোহার। তাহাকে আবার পালিশ করার কি প্রয়োজন, বুঝিলাম না। এক একটী দরজার পিছনে তিন তিন ঘণ্টা খাটিলাম কিন্তু কিছুই প্রভেদ দেখিলাম না। তবে মেঝেটার চেহারা কিছু ফিরিয়া গেল বটে। আমার সঙ্গে কাফ্রিরাও কাজ করিতেছিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে নিজেদের দণ্ডবৃত্তান্ত বলিতেছিল,—এ দণ্ডভোগ আমার কেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেছিল। কেহ কেহ প্রশ্ন করিল, চুরী করিয়াছি কি না; কেহ আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—কি হে, মদ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলে না কি? তাহাদের কথাটা এক আধটু বুঝিবার পর যখন তাহাদিগকে নিজের কথা বলিলাম, তখন সকলেই পরামর্শ দিল,—"কোয়াইট্ রাইট্ (বেশ করিয়াছ), অমলু গুডে (গোরারা খারাপ লোক), ডোণ্ট্ পে ফাইন্ (জরিমানা দিও না)।" ইত্যাদি! আমার কুঠুরীর গায়ে লেখা ছিল—"আয়সোলেটেড্" বা সলিটারী সেল্। আমার পাশেই এমন ধারা আরও পাঁচটী কুঠুরী দেখিলাম। আমার প্রতিবেশী ছিল একজন কাফ্রি, সে খুন করিবার চেষ্টা করার অপরাধে অপরাধী। তাহার পিছনে আরও তিনজন কাফ্রি ছিল, তাহারা পাশবিক ব্যভিচার অপরাধে কারারুদ্ধ।

এমনই সঙ্গীদের মধ্যে, এই অবস্থার ভিতরে, প্রিটোরিয়া জেলে আমার অভিজ্ঞতার আরম্ভ।

ভোজন।

খাবার ব্যবস্থাও তেমনি। সকালে "পূপূ", দ্বিপ্রহরে তিনদিন "পূপূ" ও আলু অথবা গাজর, তিনদিন "বীন্"; সন্ধ্যার সময়ে—ভাত (ঘি না দেওয়া)। বুধবার দ্বিপ্রহরে "বীন্‌স্", ভাত, ঘি; ও রবিবারে "পূপূ" ভাত ও ঘি পাওয়া যাইত। বিনা ঘিয়ে ভাত খাওয়া কষ্টকর; তাই যতদিন না ঘি পাই ততদিন ভাত খাইব না স্থির করিলাম। সকালে ও দ্বিপ্রহরে "পূপূ" মিলিত—কখনও কাঁচা, কখনও বা আখের রসের মত পাতলা। "বীন্‌স্" কখনও কখনও কাঁচা থাকিত, তবে প্রায়ই ঠিক পাইতাম। তরকারির বেলায় ছোট ছোট চারিটি আলু (সেগুলি আট আউন্স বলিয়া ধরা হইত।) ও গাজরের দিন তেমনই ছোট ছোট তিনটি গাজর।

সকালে কোনও কোনও দিন ২।৪ চামচ "পূপূ" খাইতাম বটে, কিন্তু সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরের খাওয়ার উপরই দুই মাস কাটাইয়া দিলাম। এই উদাহরণ হইতে আমার বোক্‌সরষ্ট জেলের ভ্রাতৃবৃন্দের বোঝা উচিত, নিজেরা রাঁধিবার সময়ে যদি কোনও জিনিষ কিছু কাঁচা থাকিত তখন ইহা লইয়া রাগ করা উচিত হয় নাই। বলুন, এ অবস্থায় কাহার উপরে রাগ করিতে পারা যায়? এখানেও একটা ব্যবস্থা করা যাইত বটে, তবে আমার মতে এবিষয়ে অভিযোগ করা আমাদের সাজে না। যেখানে সকলেই ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারে, সেখানে কেমন করিয়া অভিযোগ করা যায়? অভিযোগে সকলেই একমত হওয়া দরকার।

কখন কখন দারোগাকে জানাইতাম, আলু কম হইয়াছে; তখন সে আরও আলু আনিয়া দিত। কিন্তু এমন করিয়া আর কতদিন চলে? একদিন দেখিলাম, দারোগা আমার জন্য অন্য একজনের বাটি হইতে আনিয়া দিতেছে। সেই দিন হইতে বলাই ছাড়িয়া দিলাম।

সন্ধ্যার সময় ভাতে ঘি পাওয়া যাইত না ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এবং যাহাতে এ বিষয়ে কোনও একটা ব্যবস্থা হয়, তাহা করিব স্থির করিয়াছিলাম। বড় দারোগাকে বলিলে সে উত্তর দিল,—ঘি ত' কেবল বুধ ও রবিবার দিন দ্বিপ্রহরে মাংসের বদলে পাওয়া যাইতে পারে,—যদি বেশী দরকার হয় তবে ডাক্তারের কাছে যাইতে হইবে। পরদিন ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে চাহিলাম—দেখা হইল।

ডাক্তারকে বলিলাম,—চর্ব্বির বদলে ভারতীয় কয়েদীদের জন্য যেন ঘি দেওয়া হয়।

সেখানে বড় দারোগাও ছিল, সে বলিল,—গান্ধীর প্রার্থনা অন্যায়। এতদিন ত' কত ভারতীয় কয়েদী চর্ব্বিও খাইয়াছে, মাংসও খাইয়াছে। চর্ব্বি নিলে শুক্‌না চাল দেওয়া হয়, তাহাও লোকে বেশ খায়। সত্যাগ্রহ কয়েদীরাও ত সকলেই খায়। জেলে আসার সময় তাহাদের ওজন নেওয়া হইয়াছিল, যাওয়ার সময় আবার ওজন করিয়া দেখা গেল, ওজন বাড়িয়াই গেছে।

ডাক্তার বলিলেন,—এর উপর আর কি বলিতে পার? উত্তর দিলাম —এ ঘটনা জানি না, তবে নিজের বিষয় বলিতে পারি যে যদি একেবারেই ঘি না পাই, তবে নিশ্চয়ই আমার শরীর খারাপ হইবে। ডাক্তার বলিলেন,—তোমার জন্য তবে রুটির হুকুম দিতেছি; উত্তর দিলাম, এর জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমি শুধু আমারই জন্য বলিতে আসি নাই,—যতক্ষণ

না সকলেরই ঘিয়ের ব্যবস্থা হয়, ততক্ষণ আমি রুটি খাইতে পারি না। ডাক্তার বলিলেন, তা হ'লে আর আমাকে দোষ দিও না।

এবারে কি করি? বড় দারোগা যদি মধ্যে কথা না বলিত, তবে হুকুম পাওয়া যাইত। সেই দিনই আমাকে রুটি ও ভাত দেওয়া হইল ক্ষুধিত ছিলাম, কিন্তু সত্যাগ্রহী হইয়া এ অবস্থায় কি করিয়া খাই? কিছুই খাইলাম না। পরদিন ডিরেক্টারের কাছে আবেদন করিবার অনুমতি চাহিলাম। অনুমতি ত' পাওয়া গেল, তাঁহার কাছে আবেদনও করা হইল। তাহাতে জোহান্‌স্‌বর্গে ও বোক্‌সরষ্টের উদাহরণ দিয়া ঘি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম। পনের দিন পরে উত্তর আসিল। যতদিন না ভারতবাসীদের অন্য কোনও রকম খাবারের বন্দোবস্ত হয়, ততদিন আমাকে প্রত্যহ ভাতের সহিত ঘি দেওয়া হইবে। খবরটা প্রথমে আমাকে দেওয়া হয় নাই, তাই প্রথম দিন ত' ভাত, রুটি, ঘি খুব খাইয়া লইলাম। বলিলাম, রুটির দরকার নাই, কিন্তু উত্তর হইল—ডাক্তারের হুকুম, রুটি দেওয়া হইবেই। পনের দিন ত রুটি খাওয়া গেল। প্রথম দিন মজা করিয়া খাইলাম বটে, কিন্তু পরদিন জানিতে পারিলাম, এই রকম আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি তখন ভাতের সঙ্গে ঘি ও রুটি লইতে অস্বীকার করিলাম। বড় দারোগাকে বলিলাম, যতক্ষণ না সকলেই ঘি পাইতেছে, ততক্ষণ আমি খাইতে পারি না। কাছে ডেপুটি গবর্ণরও ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"তোমার ইচ্ছা।" আবার ডিরেক্টারকে লিখিলাম। আমাকে বলা হইয়াছিল, নেটালে যেমন খাবার দেওয়া হয় আমাদেরও তেমনই দেওয়া হইবে। আমি সে বিষয়ে লিখিলাম, এবং শুধু নিজের জন্য হইলে যে ঘি ইত্যাদি লইতে পারি না, তাহাও বলিলাম। শেষে প্রায় দেড় মাস পরে আদেশ আসিল, যেখানে যেখানে ভারতবাসী কয়েদী বেশী আছে, সেখানে ঘি দেওয়া হইবে। এই রূপে দেড় মাস পরে জয়

লাভ করার পর, আমার "রোজা" বা উপবাস শেষ হইল। শেষাশেষি আমি ঘি, রুটি ও ভাত খাইলাম। আমি সকালে খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, ভাত রুটী পাওয়ার পরেও কখনও কখনও দ্বিপ্রহরে "পূপূ" দিলে ৮।১০ চামচ মাত্র খাইতাম। "পূপূ" তা, নিত্য নূতন রকমের তৈয়ারী হইত। রুটি আর ঘিতে আমার যথেষ্ট হইত, তাই শরীরও ভাল হইয়া উঠিল।

যখন একাহারী ছিলাম, তখন শরীর খারাপ হইয়াছিল, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, আর প্রায় দশ দিন আধকপালী মাথাধরা রোগে ভুগিতে ছিলাম। বুক খারাপ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা গিয়াছিল।

কার্য্য পরিবর্ত্তন।

বুক খারাপ হইবার কারণ,—আমাকে দরজা ও মেঝে পরিষ্কার করার কাজ দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় দশ দিন এই কাজ করার পর ছেঁড়া কম্বল সেলাই করিয়া জুড়িবার ভার দেওয়া হইল। কাজটা ছিল একটু মিহি ধরণের। সমস্ত দিন কোমর নীচু করিয়া মেঝেতে বসিয়া কাজ করিতে হইত, তাহাও আবার কুঠুরীতে বসিয়া। ইহাতে সন্ধ্যার সময়ে কোমরেও ব্যথা হইত, চোখও ব্যথা করিত। আমার মনে হয়, বদ্ধ কুঠুরীর বাতাস খারাপ, তাই দারোগাকে একবার বলিলামও—আমাকে না হয় বাহিরে মাটী খুঁড়িবার কি অন্য কোনও কাজ দিন্, কিম্বা বাহিরে বসিয়া কম্বল সেলাই করিবার অনুমতি দেওয়া হউক্। কিন্তু তিনি দুইটি অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করিলেন। এবারও ডিরেক্টারকে লিখিলাম। শেষে ডাক্তারের হুকুম আসিল। যদি খোলা হাওয়ায় কাজ করিবার অনুমতি না পাইতাম, তবে বোধ হয় শরীর আরও খারাপ হইত। এই

অনুমতি পাওয়ার জন্য আমায় যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা আর এখানে বলার প্রয়োজন নাই। শেষে হইল এই, আমার খাবার পরিবর্ত্তন হইল, আর খোলা বাতাসে কাজ করার অনুমতি পাইলাম। লাভটা দুরকমেই হইল। যখন কম্বল সেলাই করার কাজ পাইয়াছিলাম তখন মনে হইয়াছিল, এই এক কাজ শেষ করিতে আমার সাত দিন লাগিবে আর ততক্ষণ আমারও শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু হইল ঠিক্ উল্টা। প্রথম কম্বল বোনা শেষ হইবার পরে আমি এক এক জোড়া কম্বল দুই দিনেই শেষ করিতে লাগিলাম। তখন অন্য কাজও পাওয়া গেল—যেমন, বানীয়ানে পশম ভরা, জেলের টীকিটের জন্য পকেট তৈয়ারী করা, ইত্যাদি।

আমি অনেক সত্যাগ্রহীকেই বলিয়াছিলাম, যদি স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া, রোগ লইয়া জেলের বাহিরে যাইতে হয়, তবে আমাদের সত্যাগ্রহ দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ধৈর্য্য ধরিয়া আমরা সত্যপন্থা অবলম্বন করিতে পারি। চিন্তা করিলেও স্বাস্থ্য খারাপ হয়। সত্যাগ্রহীদের ত' জেলকে বাড়ী মনে করাই উচিত।

আমি এই ভাবিয়াই কষ্ট পাইতাম যে আমাকেই শেষে যেন কোনও রকমে রোগ নিয়া বাহির হইতে না হয়। পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত, আমার জন্য যে ঘিএর অনুমতি হইয়াছিল তাহার জন্য সে চেষ্টা না করিলে সত্যাগ্রহে আমার শরীর খারাপ হইত। কিন্তু অন্যের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। প্রত্যেক কয়েদী যখন একলা থাকে তখন নিজের অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারে। প্রিটোরিয়ায় আমার এরূপ না করার বিশেষ কারণ ছিল। এই কারণেই আমি শুধু নিজের জন্য ঘি লওয়ার অনুমতি মানিয়া লইতে পারি নাই।

অন্যান্য পরিবর্ত্তন

উপরে বলিয়াছি, দারোগার আমার উপরে বিশেষ খোসনজর ছিল না, সেই একটু কড়া ব্যবহার করিত। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন রহিল না। সে যখন জানিতে পারিল যে আমি খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্বয়ং সরকার বাহাদুরের সঙ্গেও ঝগড়া করিয়া বসি, কিন্তু তখনি আবার তাহার সকল আজ্ঞাই পালন করি, তখন সে তাহার আচরণ পরিবর্ত্তন করিল। সে আমাকে যাহা খুসী করিতে দিত। এমন কি, পায়খানায় যাওয়ার এবং স্নান করিবার কষ্ট ও দূর হইয়া গেল। সে জানাইতও না যে তাহার হুকুম আমার উপরও চলিবে। সে বদ্‌লী হইবার পর তাহার স্থানে যে দারোগা আসিল, সে ছিল খুব উদার। সে আমায় ন্যায্য ও যোগ্য সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করিত। সে বলিত, 'যে লোক নিজের জাতির জন্য লড়াই করে তাহাকে আমি খুব ভালবাসি। আমি নিজেই লড়াই করি, তোমাকে আমি কয়েদী বলিয়া মনে করি না।' এই রকম নানা কথা সে বলিত।

কিছু দিন পরে আমাকে সকালে ও সন্ধ্যায় আধঘণ্টার জন্য জেলের ভিতর পথে বেড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইল। যখন বাহিরে বসিয়া কাজ করিতাম তখনও এই ব্যবস্থা বলবৎ রহিল। মনে হয়, যে সকল কয়েদীর বসিয়া কাজ করিতে হয় তাহাদের জন্য এইরূপ নিয়ম করা উচিত।

আমি বেঞ্চের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম, পাওয়া যায় নাই। কিছু দিন পরে বড় দারোগা তাহাও পাঠাইয়া দিল। জেনারাল স্মাট্‌স্ দুইখানি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং মনে হইল, আমাকে যে কষ্ট দেওয়া হইতেছে তাহা তাঁহার আজ্ঞা অনুযায়ী নহে, বরং তাঁহার ও অন্য সকলের অজ্ঞাতসারে, আমাকে কাফ্রিদের মধ্যে গণ্য করাতেই এত কষ্ট। আর একটা কথা ত পরে স্পষ্ট জানিতে পারিয়াছিলাম,—আমাকে যে

একলা রাখা হইয়াছিল তাহার কারণ আমি যাহাতে অন্য কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে না পারি। কিছু চেষ্টার পরে নোটবুক ও পেন্সিল রাখার অনুমতিও পাইলাম।

ডিরেক্টারের সহিত সাক্ষাৎ।

আমি প্রিটোরিয়া পৌছিলেই মিঃ লীচিন ষ্টাইন্ বিশেষ অনুমতি লইয়া আমার সহিত দেখা করিলেন। তিনি শুধু আফিসের কাজের সম্বন্ধে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। তাহার উত্তর দিতে চাহিতেছিলাম না, কিন্তু তিনি যখন বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন, তখন বলিলাম—"আমি ত বেশী কথা বলি না, শুধু এই টুকুই বলিতে পারি, আমার সঙ্গে খুব নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইতেছে। জেনারেল স্মাট্‌স্ এইভাবে আমার সত্যাগ্রহ ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাহা কখনও সম্ভব হইবে না। যে কোনও কষ্ট আমাকে দেওয়া হউক, আমি সকলই সহ্য করিতে প্রস্তুত। আমার মন শান্ত হইয়া গেছে। কিন্তু আপনি এ কথা প্রকাশ করিবেন না। যখন মুক্তি পাইব তখন সকল কথা জগৎকে জানাইব।" তবুও মিঃ ষ্টাইন মিঃ পোলককে একথা বলেন। মিঃ পোলকও সে কথা পেটে রাখিতে পারিলেন না, তিনি আর সকলকে বলিয়া বেড়াইলেন। যখন মিঃ ডেভিড পোলক, লর্ড সেলবোর্ণকে লিখিলেন ও খোঁজ খবর আরম্ভ হইল, তখন ডিরেক্টার আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাকেও আমি এই কথা বলিলাম। তাহা ছাড়া, যে অভিযোগগুলির কথা উপরে বলিয়াছি সেগুলির কথাও তাঁহাকে বলিলাম। এ ঘটনার প্রায় দশ দিন পরেই আমি শুইবার জন্য চৌকী, বালিশ, রাত্রে পরিবার জন্য কামিজ, ও

মুখ মোছার জন্য রুমাল পাইলাম। প্রত্যেক ভারতবাসীরই যে এ গুলির প্রয়োজন, আমি সে কথাও বলিয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে যে গোরাদের চেয়ে ভারতবাসী শোওয়া বসা বিষয়ে বিলাসী। বিনা বালিশে শোওয়া ভারতবাসীর পক্ষে বড় কঠিন।

এই ভাবে খাওয়ার ও খোলা হাওয়ায় কাজ করার সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে শুইবার সুবিধাও হইয়া গেল। কিন্তু কপাল যায় সঙ্গে; চৌকী জুটিল, কিন্তু তাহা আবার ছারপোকায় ভরা। প্রায় ১০ দিন চৌকী ব্যবহার করিলাম না, তাহার পর বড় দারোগা যখন ঠিক করিয়া দিল, তখন তাহাতে শুইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এতদিনে আমার মেঝেতে কম্বল পাতিয়া শোওয়ার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং চৌকী পাইয়া বিশেষ কিছু সুবিধা অসুবিধা আর হইল না। আমি বালিশের কাজ বইগুলি দিয়া চালাইতেছিলাম, সুতরাং বালিশ পাইলেও বিশেষত্ব কিছু বোধ করিলাম না।

হাতকড়া পরিতে হইল।

প্রথম হইতেই আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হইতেছিল তাহার সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় আরও বদ্ধমূল হইল। চার পাঁচ দিন পরে মিসেস্ পিলের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য আমার উপর সমন দেওয়া হইল। আমাকে আদালতে লইয়া যাওয়া হইল। সেই সময়ে আমার হাতে হাতকড়ী দেওয়া হয়। দারোগা কৃপা করিয়া একটু জোরেই দিয়াছিলেন, হয়ত বা অজ্ঞাতসারে এরূপ ঘটিয়া থাকিবে। বড় দারোগা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে অনুমতি চাহিলাম, একখানা বই সঙ্গে লইয়া যাইব; সে ভাবিল, হাতকড়ী পরিতে লজ্জা, তাই এই প্রার্থনা। সে বলিল,—"বইখানা এমন ভাবে দুই হাতে লও যাহাতে

হাতকড়ী ঢাকা পড়ে।” হাসি আসিল; হাতকড়ী পরাটা ত আমি সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। এমন পুস্তক হাতে পড়িল, যাহার অর্থ—ঈশ্বরের রাজ্য তোমার হৃদয়েই রহিয়াছে—“The Kingdom of God is within you” Tolstoi. মনে মনে বলিলাম, ভাল সুযোগ পাওয়া গেল। বাহির হইতে যত বিপদই আসুক, ঈশ্বরের স্থান যদি আমার হৃদয়ে থাকে, তবে আর ভয় কি ?

এইভাবে আমায় আদালতে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইল। ফিরিবার সময়ে জেলের ঠেলাগাড়ীতে আসিয়াছিলাম। ভারতবাসীরা বোধ হয় এ কথা জানিতে পারিয়াছিল যে, আমি ঐ পথ দিয়া যাইব। তাই আদালতের সম্মুখে অনেক ভারতবাসী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ এম্বকলাল ব্যাস, মিসেস পিলের উকিলের সাহায্যে আমার সহিত দেখা করিলেন। আমাকে আর একবার আদালতে যাইতে হইয়াছিল, সেবারও হাতকড়ী দেওয়া হয়, তবে যাওয়া আসা ঠেলাগাড়ীতে করিয়াছিলাম।

সত্যাগ্রহের মহিমা।

উপরে এমন অনেক কথা লিখিয়াছি যাহা হয়ত খুবই নগণ্য, উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু সেগুলি বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি শুধু ইহাই দেখাইবার জন্য যে সত্যাগ্রহ ছোট বড় সকল ঘটনাতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ছোট দারোগা আমাকে যে শারীরিক কষ্ট দিল তাহা আমি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম, ফলে আমার মন শান্ত হইল। শুধু তাহাই নহে, শেষে তাহাদেরি আপনা হইতে এ অন্যায় দূর করিতে হইল। আমি যদি সে গুলির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতাম তবে শুধু আমার মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, এবং যে বড় কাজ আমি করিতেছিলাম তাহা অসম্পূর্ণই থাকিয়া

যাইত। তাহা ছাড়া, দারোগাকেও শত্রু করিতাম। আহারের দুঃখও প্রথমে সহ্য করিয়াছিলাম, নিজের মতে চলিয়াছিলাম বলিয়াই পরে আপনা হইতে সব দূর হইল। এমনই ভাবে সামান্য সামান্য বিষয়েও এই সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ইহার মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রধান লাভ—শারীরিক কষ্ট সহিতে সহিতে মনের বল অনেকখানি বাড়িয়া গেল। এই তিনমাসে অনেক শিক্ষা পাইয়াছি, তাহার বলেই আজ অধিকতর দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। দেখিতেছি যে ঈশ্বর অনুক্ষণ সত্যাগ্রহীর সহায়, তাই তিনি প্রাণপণ কষ্ট দিয়া সত্যাগ্রহের পরীক্ষা করেন।

কি কি বই পড়িয়াছিলাম।

আমার সুখ দুঃখের কথা শেষ হইয়াছে। এই তিন মাসে আমার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে! সব চেয়ে বড় লাভ,—এই সময়ে পড়াশোনা করিবার খুব সুবিধা মিলিয়াছিল। প্রথম প্রথম অবশ্য নানা কারণে হৃদয় মন অশান্ত হইয়া উঠিত। মন থাকিলেই সর্ব্বদা বানরের মত ছট্‌ফট্‌ করে। এরূপ অবস্থায় অনেকেই দমিয়া যান। ঠিক এমন সময়ে বইগুলি আমায় বাঁচাইল। ভারতীয় বন্ধুদের অভাব অনেকটা পূরণ করিয়া দিল এই বইগুলি। সর্ব্বদাই প্রায় তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত পড়িবার সুযোগ পাইতাম। সকালে খাবার খাইতাম না, সুতরাং এক ঘণ্টা অবসর পাইতাম—সে সমস্ত টুকু পড়িতাম। সন্ধ্যাবেলায়ও তাহাই হইত। দ্বিপ্রহরে খাইতে খাইতেই পড়িতাম। সন্ধ্যাবেলায় বিশেষ ক্লান্ত না হইলে বাতী জালিবার পরেও পড়িতাম। শনি রবিবারে ত যথেষ্ট সময় পাইতাম। এই সময়ে প্রায় ত্রিশখানি বই পড়িয়া ফেলি। ইংরেজী, হিন্দী, গুজরাটী, সংস্কৃত ও তামিল

ভাষার বই ছিল; ইংরেজী পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য টলষ্টয়, এমার্সন ও কার্লাইলের গ্রন্থাবলী। প্রথম দুইখানি ধর্ম্মবিষয়ক, তাই এই সঙ্গে আমি জেলে বাইবেলও আনিয়াছিলাম। টলষ্টয়ের পুস্তকগুলি এরূপ সরস ও সরল যে, যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী লোক সে গুলি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন। তাঁহার বইগুলি পড়িয়া মনে হইত, তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন জীবনে তাহা নিশ্চয় পালন করিয়াছেন।

কার্লাইলের "ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন"—ফরাসী-বিপ্লব সম্বন্ধীয় পুস্তক পড়িতেছিলাম; বইখানি খুব জোরে লেখা। বইখানি পড়িয়াই মনে হইয়াছিল, ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের পন্থা ইউরোপীয় পন্থার সহিত খাপ খাইতে পারে না। আমার বিশ্বাস, বিপ্লবে ফরাসীদের বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। ম্যাট্‌সিনির মতও তাহাই। এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, এখানে সে বিচারের স্থান নাই। কিন্তু ইহাতেও কয়েকজন সত্যাগ্রহীর দৃষ্টান্ত পাইলাম। গুজরাতী, হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তকগুলির মধ্যে স্বামিজী, বেদশব্দসংজ্ঞা ও ভট্ট কেশবরামের উপনিষদ্ পাঠাইয়াছিলেন; মিঃ মোতিলাল দীবান মনুস্মৃতি পাঠাইয়াছিলেন; ফিনিক্সে ছাপা রামায়ণসার, পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র, নাথুরামকৃত আহ্নিকপ্রকাশ, প্রোফেসর পরমানন্দ কর্ত্তৃক দত্ত সাঙ্খ্যগীতা এবং ৺স্বর্গীয় কবি রায়চন্দ্রের কবিতাও পাইয়াছিলাম। এগুলির মধ্যে ভাবিবার অনেক কিছু পাইয়াছিলাম। উপনিষদ্ পাঠে শান্তিলাভ করিয়াছিলাম, তাহার একটি বাক্য—আমার হৃদয়ে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে,—তাহার মর্ম্ম "যাহা কিছু কর, সকলই আত্মার কল্যাণের জন্য করিও"। উপনিষদে আরও কত চিন্তার সামগ্রী পাইয়াছিলাম। কিন্তু সব চেয়ে বড় আনন্দ পাইয়াছিলাম, কবি রায়চন্দ্রের পুস্তকপাঠে। আমার মতে তাঁহার রচনা সকলেরই আদরণীয়। টলষ্টয়ের মত তাঁহার আদর্শও মহান্। ইহা হইতে এবং সন্ধ্যার পুস্তক হইতে

অনেক অংশ আমি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। রাত্রে যতক্ষণ না ঘুম আসিত ততক্ষণ সেগুলি আবৃত্তি করিতাম, ও প্রত্যহ সকালে আধঘণ্টা সেই বিষয়ে চিন্তা করিতাম। তাহাতে মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিত। যখন কোনও নিরাশার ভাব মনে মনে জাগিত, তখন সেগুলি মনে করা মাত্র হৃদয় শান্ত হইত, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। এ বিষয়ে নানা কথাই পাঠককে বলিবার মত, তবু তাহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। শুধু ইহাই বলিতে চাহি, যে, সৎগ্রন্থ অনেক সময় সৎসঙ্গের অভাব কিয়দংশে পূর্ণ করিতে পারে; সুতরাং যে সকল ভারতীয় কয়েদী জেলেও আনন্দ লাভ করিতে চাহেন তাঁহাদের সৎগ্রন্থ পাঠের অভ্যাস রাখা উচিত।

তামিল শিক্ষা।

এই সত্যাগ্রহসংগ্রামে তামিল ভ্রাতৃবৃন্দ যত কাজ করিতেছিলেন, অন্য ভারতবাসী তত করিতে পারেন নাই। তাই মনে হইল, অন্য কোনও কারণ না থাকিলেও শুধু মুক্ত হৃদয়ে তাহাদের উপকার স্বীকার করিবার জন্যই আমার ভাল করিয়া তামিল পড়া উচিত। সুতরাং শেষের একমাস বিশেষ করিয়া তামিল পড়িবার জন্য কাটাইলাম। তামিল যতই পড়িতে লাগিলাম, ততই ভাষাটি খুব ভাল লাগিতে লাগিল। ভাষাটি যেমন সরস, তেমনি মধুর। তামিল রচনাবলী পড়িয়া মনে হইল, অতীতে এবং বর্ত্তমানেও এই ভাষাভাষী লোক খুব বিচারবান্, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতকে যদি এক করিতে হয়, তবে মান্দ্রাজের বাহিরের অনেক ভারতবাসীরই তামিল শেখা উচিত।

শেষ কথা।

আমার আশা যাঁহারা এই কাহিনী পাঠ করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়ে এখনও দেশপ্রীতি জাগে নাই তাহা জাগরিত হইবে, তাঁহারা সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিবেন, আর যাঁহাদের হৃদয়ে দেশপ্রীতি পূর্ব্ব হইতেই জাগরূক তাঁহাদের সে প্রীতি দৃঢ়তর হইবে। যিনি আপনার ধর্ম্ম জানেন না, তাঁহারা দেশপ্রীতি সত্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে।